এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

পীর ও পুলিশ

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

এনায়েতুল্লাহ আলতামাস

পীর ও পুলিশ

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
অনূদিত

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা) || ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ || ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ❑ ডিসেম্বর–২০১২

পীর ও পুলিশ

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাস

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন অনূদিত

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন-৭১১১৯৯৩, স্বত্ব ❑ প্রকাশক
প্রচ্ছদ ❑ নাজমুল হায়দার, কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট
মুদ্রণে ❑ বরাত প্রিন্টার্স, ২২ ঋষি কেস দাস
রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

মূল্য ❑ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISBN : 984-839-156-04

ভূমিকা

নশ্বর স্মৃতিতে কত কিছুই না ধারণ করা হয়ে থাকে। কত কথা কত বিচিত্র ঘটনা। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা কত দৃশপট স্মৃতিপটে অংকিত হয়ে যায়। প্রতিদিন, কখনো কখনো প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন স্মৃতি তৈরি হয়। এজন্য পুরোনোদের ক্ষয়ে যেতে সময় লাগে না। তার ওপর কালের পলিমাটি পড়ে তা ধূসর -জঞ্জাল হয়ে যায়।

অতি প্রয়োজনীয় স্মৃতিকথাও অনেক সময় মস্তিষ্কের অতল থেকে উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু কিছু কিছু কথা ঘটনা নশ্বর স্মৃতিতে অংকিত হয়ে অবিনশ্বর হয়ে রয়ে যায়। মস্তিষ্কের নিউরন সেল ভেঙ্গে যায়, অক্ষম হয়ে যায়, তবুও সে স্মৃতির গলিপথ সবসময় আলোকিত হয়ে থাকে। স্মৃতি পথে হাটতে গেলেই চুম্বকীয় শক্তি সেই গলিপথের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চরিত্র, চরিত্রের অনুসঙ্গ এমনিই স্মৃতির উজ্জ্বল গলিপথ থেকে স্বআলোয় উদ্ভাসিত। স্মৃতির এক পাণ্ডুলিপি থেকে অজস্র স্মৃতিতে তার রূপান্তর ঘটবে; কিন্তু তার চুম্বকীয় শক্তি ক্ষয় হবে না; আরো সতেজ-দুরন্ত এবং অন্যকে বিহ্বল করে দেয়ার মতো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

সূচিপত্র

পীরের কেরামতি
যারিনার তেলেসমাতি

বিয়ের এক মাস পর কারো স্ত্রী লা পাত্তা হয়ে গেলে আমার মতে সেটা যে কারো জন্যই সমুদ্রের অতলান্তে পড়ার মতো ঘটনা। আমি তখন সাব-ইনপেক্টর ছিলাম।

এক লোক একদিন থানায় এসে জানালো, বিয়ের এক মাসের মাথায় তার স্ত্রী লা পাত্তা হয়ে গেছে। তার ভেতরে ক্রোধের আগুন জ্বললেও চেহারা ছিলো লজ্জায়– অনুতাপে আনত।

থানার রিপোর্ট করতে তার সঙ্গে আসে তার বাবা ও মেয়ের বাবা। দুদিন হয়েছে এক মাসের বধু কন্যা গুম হয়েছে। অর্থাৎ এক মাস আগের বিয়ে যাদের হয়েছিল সেই বর বাড়ি থেকে গুম হয়েছে। তাদের দাবী, মেয়ে অপহৃত হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কে অপহরণ করেছে? তাদের এটা জানা নেই।

তাহলে কি কাউকে সন্দেহ হয়? না, তাদের কাছে কাউকে সন্দেহজনক মনে হয় না।

ওদের গ্রামটি ছোটও নয়, বড়ও নয়। মাঝারি ধরনের। এরা স্বচ্ছল মুসলিম পরিবার। মেয়েও বাড়িও বেশ অবস্থাসম্পন্ন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেয়ে লাপাত্তা হলো কি করে?

তারা জানালো, তাদের বাড়ি পাকা করা। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িই কাঁচা। মেয়ের শ্বশুর বাড়ি সে তুলনায় পাকা তো বটেই, বড়সড় এক হাবেলি সেটা, উঠোনের দুদিকে দুই সারি ঘর। এক দিকের এক ঘরে রাতে গুম হওয়া মেয়ে যারিনা ও তার স্বামী ইকবাল শুয়েছিলো। ওরা ওই ঘরেই থাকে। ঘরের অন্যরা আরেকদিকের ঘরগুলিতে থাকে।

ভোরের আঁধার থাকতেই যারিনার শ্বশুর শাশুড়ি উঠে পড়েন। প্রতিদিন তারা এ সময়ই উঠেন। গাভী ও মহিষের দুধ দোহনের ব্যাপারে তদারকি করেন। সেদিনও উঠে দেউরীতে গিয়ে দেখেন সদর দরজা খোলা।

যারিনারন শ্বশুর শাশুড়ির আগে এবাড়িতে আর কেউ উঠে না। দরজা খোলা দেখে শ্বশুর যারিনার কোঠায় গিয়ে দেখলেন, তাদের বউ যারিনা বিছানায় নেই। শ্বশুর শাশুড়িকে গিয়ে জানালেন। শাশুড়ি ভাবলেন হয়তো তাজা হাওয়া খেতে বাইরে গেছে। একটু পর চলে আসবে।

কিন্তু সকাল গড়িয়ে বেলা চড়ার পরও যারিনা ফিরলো না।

যারিনাদের বাড়ি সেখান থেকে দেড় মাইল দূরে। সেখানে গিয়েও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না, কোথায় খুঁজবে কোথায় যাবে কেউ কিছুই বুঝতে পারছিলো না। আশে পাশের বাড়িগুলোতেও খোঁজা হলো। অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিনটি এভাবেই কেটে গেলো।

রাতে যারিনার বাবা ও শ্বশুর তাদের এলাকার পীরের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

পীর সাহেব নানা হিসাব কিতাব করে বললেন, মেয়ে তো অনেক দূরে চলে গেছে। ফিরেও আসবে। তবে চেষ্টা করতে হবে খুব। পীর সাহেব তাদেরকে এক মুঠি কালো মাসকেলাই– এর অর্ধেক থাকবে পেষা এবং আরো কয়েকটা জিনিস আনতে বললেন।

এসব জিনিস সময় মতো পীরকে দেয়া হলো।

পীর নিশ্চয়তা দিলেন, সন্ধ্যার দিকে মেয়ে উড়তে উড়তে চলে আসবে। যারিনার বাবা ও শ্বশুর পীরকে দ্বিগুণ নজরানা দিয়ে বিদায় হলেন।

যেমন আর্জেন্ট ছবি বা তাৎক্ষণিক ড্রাই ওয়াশ করতে হলে দ্বিগুণ মজুরি দিতে হয় তেমনি তারাও পীরকে বলে আসলেন, সন্ধ্যার আগে যদি মেয়ে ফিরে আসে ঝোলা ভরে পয়সা দিয়ে যাবেন দরবার শরীফে। যারিনার বাবা তো পীর সাহেবকে একটি বকরি দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরে যখন শুনলাম, ওদেরকে থানায় পাঠিয়েছে এক শিখ ভদ্রলোক তখন খুব আফসোস হলো পীরের জন্য। শিখ তাদেরকে পরামর্শ দেয়, আরে মিয়ারা বেওকুফী বন্ধ করে থানায় যাও। পুলিশকে ঘটনা খুলে বলো। এ সব পীর সাহেবরা মেয়েদের অপহরণ করতে পারবেন কিন্তু অপহৃত মেয়ে উদ্ধার করতে পারবে না।

যা হোক, উভয় পক্ষের অভিভাবকরা এ ঘটনা গোপন রাখার খুব চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কোন কিছুর ওপর বেশি দিন পর্দা ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

মেয়ে কি ঘর থেকে কিছু নিয়ে গেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না কিছুই নিয়ে যায়নি। আমরা খোঁজ করে দেখেছি। এসব নিশ্চিত হয়েই তো আমরা বলছি, আমাদের মেয়েকে অপরণ করা হয়েছে। শ্বশুর জবাব দিলেন তটস্থ হয়ে।

কারো সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা ছিলো?

না, জনাব! শ্বশুর বললেন, ছোট খাটো ঝগড়া ঝাটি তো একজনের সঙ্গে আরেকজনের হয়েই থাকে। হত্যা বা অপহরণ করার মতো শত্রুতা তো কারো সঙ্গে নেই।

দেউরির দরজা কি ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো?

খুব ভালো করে বন্ধ ছিলো। আমি নিজেকে শিকল লাগিয়ে ছিলাম, শ্বশুর বললেন।

আমাকে একটা কথা খুব ভেবে বলবেন, আমি বললাম, এমনও তো হতে পারে, অপহরণকারী বাড়ির দেয়াল টপকে ভেতরে বসেছে এবং আপনাদের মেয়েকে দরজা খুলে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

আমি যারিনার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আচ্ছা, তুমিই বলো, তুমি তো শুইয়েই ছিলে, মৃত তো ছিলে না, তারা মেয়েকে উঠানোর সময় কমপক্ষে তো সামান্যতম শব্দ ও তো করবে, ধস্তাধস্তি– চিৎকার চেচামেচি করবে। সে তো লাড়কিই ছিলো, লাকড়ি তো ছিলো না যে, কেউ এসে আরাম করে বয়ে নিয়ে চলে গেছে।

আমি জানি না সে কিভাবে গিয়েছে। স্বামী বেচারার গলা কেঁপে উঠলো। 'আমি আপনাদের সবাইকে বলছি মেয়ে নিজ ইচ্ছায় চলে গেছে'– আমি প্রাথমিক ফয়সালা শোনালাম আমি আপনাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি, মেয়ের চাল চলন কেমন ছিলো?

আপনারা বলবেন, মেয়ে বড় সতী স্বাধ্বী ছিলো। কিন্তু আমি বলছি ঐ মেয়ে তার স্বামী ইকবাল ছাড়া আরো অন্য কাউকেও পছন্দ করতো। তার গলা ধরেই মেয়ে হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। এখন হয়তো আপনারা বলে উঠবেন। সে তো ইকবালের জন্য জান কবুল মেয়ে ছিলো........

আমি জানতে চাই, কে আপনাদের মধ্যে সত্য বলবেন?

তিনজনের কারো মুখ দিয়েই কথা বেরোলো না। যেন তাদের বাক শক্তি অসা হয়ে গেছে।

'জনাব! আমরা তো এটাই বলবো যে, আমাদের মেয়ে এরকম ছিলো না। আপনি যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। একেবারে চুপচাপ শান্ত মেজাযের ছিলো ঐ মেয়ে।' নিরবতা ভেঙ্গে শ্বশুর বলে উঠলেন।

তারা মূল্যবান দুটা দিন সময় নষ্ট করে এখানে এসেছেন। তাই মেয়ে কি নিজেই চলে গিয়েছে না অপহৃত হয়েছে তা জানাটা এখন বেশ দুরূহ হয়ে গেছে।

'আপনারা কি আপনাদের পীর সাহেবকে জানাননি যে, সন্ধ্যার পরও মেয়ে ফিরে আসেনি?

'জানিয়েছিলাম জনাব! শ্বশুর বললেন, তিনি বলেছেন, মেয়ের ওপর কঠিন তাবিজ করা হয়েছে। ফিরে আসবে, তবে সময় লাগবে অনেক দিন'।

*** *** ***

যারিনার শ্বশুর বাড়ি অর্থাৎ ইকবালের বাড়িতে গেলাম আমি। বাড়ির বারান্দার দিকের যে ঘরে ইকবালরা থাকতো প্রথমে সে ঘরে গেলাম।

স্বামী স্ত্রীর খাট দু'টি পরস্পরে সঙ্গে লাগানো ছিলো। আর বাড়ির চার দেয়ালও এত উঁচু যে, সাধারণভাবে সেটা টপকে ভেতরে যাওয়া সহজ নয়। ছাদ দিয়েও ভেতরে ঢোকা মুশকিল হবে। এ ঘর থেকে একমাত্র পেশাদার ডাকাত ছাড়া অন্য কেউ জলজ্যন্ত একটা মানুষ উঠিয়ে নিতে পারবে না।

আমার মনে আরেকটা সন্দেহ উকি দিলো যে, যারিনার স্বামী ইকবালও তো কোন কারণ যারিনাকে হত্যা করতে পারে। তারপর লাশ কোথাও ফেলে আসতে পারে।

কিন্তু এই সন্দেহ এজন্য কাঁচা যে, ইকবাল যারিনাকে হত্যা করে লাশ কোথাও ফেলে আসলে– কোথাও না কোথাও থেকে লাশ পাওয়ার খবর আসতো। অবশ্য লাশ দাফনও করে দিতে পারে। ইকবালের ওপর আমার সন্দেহ আরেকটা কারণ ছিলো। সে সবসময় চুপ চাপ। ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে এখানে আসে। সব কথার জবাব তার বাবাই দিচ্ছিলেন।

'জনাব, ইকবালের বাবা বললেন, 'আমার ছোট মাথায় একটা কথা এসেছে, যারি না যদি নিজেই যেতো তাহলে সঙ্গে করে সোনাদানা টাকা পয়সাও নিয় যেতো।

আমি কথাটাকে জরুরী মনে করলাম না। ওর পরকীয়া সম্পর্ক এমন লোকের সঙ্গেও হতে পারে যে বেশ ধনাঢ্য। তার সোনাদানার প্রয়োজন নেই।

যা হোক, এসব কথা এখনই আমার জানা জরুরী নয়। আর যারিনার শ্বশুরের পরামর্শ আমার এজন্য প্রয়োজন নেই যে, তার নাক কাটা গেছে এবং সেখানে এখন মাছি বসেছে। কারো ঘর থেকে নববধূর পালিয়ে যাওয়াটা বড় দুর্নামের বিষয়। আমার কাছে এমন অনেক মাধ্যম আছে যার দ্বারা মাড়ির নিচের গোপন বিষয়ও আমার জানা হয়ে যায়।

এখানে আরেকটা দিক আছে, এ ঘটনা যে সময়ের সে সময়টা আজকের তুলনায় অনেক পবিত্র ছিলো। মানুষের মধ্যে আদর্শ আর নীতিবোধ বিপুলভাবে জাগ্রত ছিলো। ছেলে মেয়ের অবাধ মেলা মেশা ছিলো অকল্পনীয় ব্যাপার। লজ্জা

ও শ্লীলতা ছিলো সমাজের ভূষণ। তাই কোন বাড়ি থেকে কোন মেয়ের উধাও হয়ে যাওয়াটা যেমন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিলো তেমনি ছিলো দুঃসাহসের ব্যাপার।

আমি ইকবালকে পৃথকভাবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তাকে সতর্ক করে দিলাম, হয় সে নিজে বলবে না হয় অন্যদেরকে আমি জিজ্ঞেষ করে জেনে নেবো আসল ঘটনা কি? তবুও ওর জবাব আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। ওকে বিদায় করে ওর মাকে নিয়ে বসলাম।

'না-জ্বি: আমি পরিষ্কার ভাষায় বললাম, 'এখন আর নিজের সম্মান অসম্মানের কথা মনে রাখবেন না। এসব বিষয় যখন পুলিশের হাতে চলে যায় তখন আর কোন কিছুর পরওয়া থাকে না। আপনার বউ যে নিজে ইচ্ছায় গিয়েছে এটা নিশ্চিত। কোন দুশ্চিন্তা না কর আমাকে সব কথা খুলে বলুন। সবার আগে বলুন, মেয়ের স্বভাব চরিত্র কেমন ছিলো? চাল চলন কেমন ছিলো? আপনার ছেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোন ধরনের ছিলো? এমনকি ঘরের অন্যদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিলো তার? চঞ্চল বুদ্ধিমান ছিলো, না সরলা- লাজুক ছিলো'?

'ওর দুটি গুণ দেখে আমরা আত্মীয়তা করি- ইকবালের মা বললেন, একটা হলো তার রূপ। আরেকটা হলো তার শান্ত স্বভাব। ওদের বাড়িতেও সে স্বল্প ভাষী ছিলো। নামায রোযার প্রতিও খুব যত্নশীল।

'সবসময় খুব যত্নশীল।'

'সবসময় কি উধাস উধাস মন মরা থাকতো'

'না, হাসি খুশি থাকতো'

'আর আপনাদের বাড়িতে'

'এখানেও চুপচাপ থাকতো'

'আর হাসি খুশি?'

ইকবালের মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। চিন্তামুক্ত কণ্ঠে বললেন,

'ওদের বাড়ির মতো এখানে হাসি খুশি থাকতো না।'

'আর ইকবালের সঙ্গে?'

'নতুন বউ এর ব্যাপার তো জানেনই। বিয়ের পর যারিনা আমাদের সামনে সব সময় ইকবালের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতো। এজন্য ওদেরকে কখনো কথাও বলতে দেখিনি।'

'এমন সুন্দরী বউ পেয়ে ইকবাল নিশ্চয় অনেক খুশি'? আমি ধারালো গলা জানতে চাইলাম। 'আমি সঠিক জবাব চাই। ভেবে চিন্তে বলবেন। এতে হয়তো জানা যাবে- যারিনা নিজ ইচ্ছায় গিয়েছে না কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেছে।'

'আমার ছেলেকে খুব খুশি মনে হতো না– ইকবালের মার হতাশ কণ্ঠ, 'আমার ছেলে তো বড় হাসিখুশি ফূর্তিবাজ ছেলে ছিলো। কিন্তু বিয়ের পর তার মুখের হাসি যেন কে কেড়ে নিয়েছে'।

'যদি জিজ্ঞেস করি যারিনার সঙ্গে আপনাদের ব্যবহার কেমন ছিলো আপনি বলবেন খুব ভালো ছিলো, সত্য কথা বলবেন না।'

'আমি সত্য না বললে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমাদের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করুন। যারিনার মাকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে ওকে প্রায়ই বলতাম, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু একটা বলো, নইলে আশ পাশের লোকেরা তো বদনাম দেবে শ্বাশুড়িকে।

'তখন সে কি বলতো?'

'তখনো নিরব থাকতো– ইকবালের মা বললেন, বউ শ্বশুড়ির যুদ্ধ তো অতি প্রাচীন প্রবাদ। কিন্তু ও তো মুখই খুলতো না।'

এই মহিলাকে নিয়ে আমি অনেক মাথা খাটালাম। এ থেকে এতটুকু পেলাম যে, ইকবাল ও যারিনার সম্পর্কের মধ্যে একটা কিন্তু ছিলো।

ইকবালের বাড়িতে যারিনা সুখী হতে পারেনি এবং ইকবালের মতো প্রাণচঞ্চল ছেলে বিয়ের পর একেবারে চুপসে যায়। আমি মাথায় এটাও টুকে রাখলাম যে, যারিনার শ্বাশুড়ি তাকে চাপের মধ্যে রাখতো কিংবা ছেলের কানভারী করে যারিনাকে তার হাতে মার খাওয়াতো। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এখনো পুত্র বধূকে মারপিট করে গর্ববোধ করে।

আরা অনেক কিছু জানার ছিলো আমার। ইকবালের বাড়িতে যারিনার মাও এসেছিলো। তাকে নিয়ে ইকবালের বাড়ির দেউরিতে বসে পড়লাম আমি।

*** *** ***

যারিনার মা খুব কাঁদছিলেন। মা হিসেবে মেয়ে হারানোর আঘাত সওয়ার মতো অবস্থা তার ছিলো না। কিছু সান্ত্বনা বাণী শুনিয়ে তাকে আমি শান্ত করলাম।

'আপনার মেয়েকে ফিরে পেতে চাইলে মেয়ে সম্পর্কে কোন কথাই গোপন রাখবেন না। আমি একটু জোরের সঙ্গে বললাম। প্রথম কথা হলো, সে কোথায় এবং কার সঙ্গে গিয়েছে এ সম্পর্কে এক আপনার কোন ধারণা আছে?

'আল্লাহর কসম সামনে রাখুন। আমার মাথার ওপর কুরআন শরীফ রেখে দিন– যারিনার মা ত্রস্ত গলায় বললেন, কারো সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার মেয়ে না আমার যারিনা। নিরবে বসে আল্লাহকে স্মরণ করা মেয়ে সে।'

'ইকবালের সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে সে কি খুশি ছিলো?'

'না জনাব! আমি সত্য সত্য বলছি সে খুশি ছিলো না।'

'কি বলতো যারিনা? ইকবাল ভালো নয় এসবই তো মনে হয় বলতো।'

'প্রথম প্রথম বলতো, আমাকে বিয়ে করাবেন না। অন্যের ঘরে আমি সুখী হতে পারবো না। আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে বললাম, ইকবাল এত সুদর্শন যুবক। ওর সঙ্গে তুমি সুখী হবে। তখন বললো, আমাকে ইকবালের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। কারণ জিজ্ঞেস করলাম, ও বললো, বিয়ে শাদীকে আমি ভয় পাই। তখন আমি মনে করেছি, অল্প বয়সী মেয়ে বলে বিয়ের কথা শুনে ঘাবড়ে গেছে।'

'আপনার কি মনে হয় মাজ্বী! আমি জিজ্ঞেস করলাম– সে কি ইকবাল পছন্দ করতো না? তাহলে কাকে পছন্দ করতো?

ইকবালকে পছন্দ করতো না এমন নয়– যারিনার মা জবাব দিলেন– আপনি ইকবালকে দেখেছেন। যেকোন মেয়েই ওকে পছন্দ করবে.... ঘরের বাইরে আমার মেয়ের কোন আগ্রহ ছিলো না, অন্যান্য যুবতী মেয়েদের মতো সে কাউকে সই সখিও বানায়নি। না, সে আর কাউকে পছন্দ করতো না। আমি কসম খেতে পারবো এ ব্যাপারে।

'কসমের কথা বলবেন না মাজী! আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। 'কেউ কারো মনের খবর জানে না,..... ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা হয়তো ওকে কষ্ট ক্লেশে যন্ত্রণা দিতো। এ কারণে সে ভয়ে পালিয়েছে।'

'সে পলিয়ে যাবে কোথায়? নিজের ঘরেই ফিরে আসতো। তাছাড়া এক মাসে সে দুই তিনবার আমার কাছে আসে। আমি ওর শ্বশুর শাশুড়ি ও ইকবালের আচার ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। সে কোনদিন কোন অভিযোগ করেনি।

'মাজী! আমার গলা দৃঢ় হয়ে গেলো– আপনার মেয়েকে আমি কোথাও না কোথাও থেকে বের করে আনবো। কিন্তু এর আগে ওর বান্ধবীদের কাছ থেকে আমি জেনে নেবো যে, সে কাউকে না কাউকে পছন্দ করতোই। নিজের ইচ্ছাতেই সে গিয়েছে। কেউ ওকে উঠিয়ে নেয়নি।'

মহিলা চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমি তার চোখমুখ জড়িপ করতে লাগলাম। মহিলা বেশ অভিজাত ঘরের। তাই তার বার্তার ধরনও ছিলো বেশ মার্জিত।

'আপনি বলছেন ও নিজ ইচ্ছাতে গিয়েছে'। মহিলা আহত গলায় বললেন, একথায় আমি দুঃখ পেয়েছি, এটা একেবারে ভুল। তবে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। সেটা হলো, যারিনার ঘুমের মধ্যে চলা ফেরার অভ্যাস ছিলো। কিন্তু.... কিন্তু আমি আর কিছু বলতে পারছি না।

ঘুমের মধ্যে চলা ফেরা করতো? আমি চমকে উঠলাম– ঘুমের মধ্যে কি সে ঘরের বাইরে চলে যেতো?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন আমার জিহ্বার ডগায় এসে ভিড় করলো। যা আমি কোন বিরতি ছাড়া এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম। যারিনার মা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন আমাকে বেকুব ঠাওরাচ্ছেন। তিনি নিশ্চয় ভাবছেন, আরে ওই বেকুব এমন করছে কেন? অবশ্য এই হতভম্ব চোখেই আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অনেকে অবশ্য জানেন, ঘুমের মধ্যে চলা ফেরা করার ওই রোগ সাধারণত শিশুদের হয়ে থাকে। অনেক শিশু আছে, যারা ঘুমের মধ্যেই বিছানা থেকে উঠে, ঘরে বা বারান্দায় ঘুরে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে। এই ঘোরা ফেরার সময় চোখও খোলে না। সকালে উঠে তার আর কিছুই মনে থাকে না। এটা এক প্রকারের মানসিক রোগ।

যারিনার মা জানালো। যারিনাও মাসে দু'একবর মাঝ রাতে উঠে চলা ফেরা করতো। ঘরের কেউ জেগে উঠলে তাকে বাঁধা দিতো। তখন তার কোন অনুভূতি হতো না যে, তাকে কউ হাটা চলা ফেরা করতে বাঁধা দিচ্ছে। আঙ্গিনায় বা বারান্দায় ঘুরে সে আবার ফিরে আসতো। দু'বার সে বাড়ির ওপর তলার দিকেও উঠে পড়েছিলো। তার ভাগ্য ভালো, দু'বারই তার মা তাকে দেখে ফেলে এবং তাকে নিচে নিয়ে আসে। তার চোখ তখন অর্ধেক খোলা থাকতো।

বিয়ের পাঁচ ছয় মাস আগ থেকে এ রোগ দেখা দেয়। অর্থাৎ তার তের চৌদ্দ বছর বয়সে এ রোগ দেখা যায়।

তার মা বাবা এ রোগের চিকিৎসা করান নানা তাবিজ কবজ ও খানকা শরীফের মাটি দিয়ে।

তাদের এটা জানা ছিলো না যে, এ হলো মস্তিষ্কের অসাড়তা। এ এমন এক মানসিক রোগ বা তাবিজ কবজ বা সাধারণ চিকিৎসা ভালো হয় না। ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এই অসুখের কথা জানতো?'

'না জনাব– যারিনার মা বললেন– বললে তো আত্মীয়তা করতে ওরা রাজি হতো না।'

যারিনার মাকে নিয়ে আমি অনেক সময় ব্যয় করলাম। তাকে বার কয়েক বললামও, তার মেয়ে অন্য কাউকে ভালো বাসতো। তারা যেন তাকে খুঁজে বের করে। কিন্তু মাহিলা অস্বীকার করে বলেন, এমন কেউ আছে বলে তার জানা নেই। আমার মাথায় যারিনার ঘুম রোগ আটকে যায়।

তারপর আমি সেখানকার চৌকিদার নৈশপ্রহরী ও দুইজন অভিজাত লোককে থানায় ডাকিয়ে এনে বললাম,

তোমাদের এলাকার একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে। তোমাদের তাই বসে থাকা উচিত হবে না। তারা যেভাবেই হোক চার দিক যেন খোঁজে বেড়ায়। যারিনার স্বভাব চরিত্র কেমন, কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিলো কিনা এসব যেন খুটে বের করে আমাকে এসে জানায়।

চৌকিদার আমাকে জানালো, ইকবাল খুব প্রাণোচ্ছল ছেলে ছিলো। কিন্তু বিয়ের পর তার ঠোটে হাসি দেখা যায়নি।

যা হোক, যারিনা বাবা, ইকবালের বাবা ও ইকবালকে আমি থানায় নিয়ে আসলাম। কেউ হারিয়ে গেলে তার মামলা নেয়ার আগে অনেক লেখালেখি করতে হয়। তারপর অন্যান্য থানায়ও হারানো ব্যক্তির নাম ঠিকানা আকার আকৃতির বর্ণনা সম্বলিত রিপোর্ট পাঠাতে হয়। রিপোর্ট লেখককে আমি এ কাজে লাগিয়ে দিলাম। আর অন্যদের বিদায় করে ইকবালকে আমার সামনে বসালাম।

*** *** ***

'তুমি যদি এখনো আমাকে কিছু না বলো তাহলে আমি বলবো, তোমার বউ তোমাকে পছন্দ করতো না। আর তুমি তাকে হত্যা করে লাশ কোথাও চাপা দিয়ে রেখেছো– আমি ইকবালকে ভীতি ধরানো গলায় বললাম–

'তোমার নিরবতা আমার সন্দেহ ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। তুমি দেখেছো, তোমাদের এলাকার কত লোকের সাথে আমি কথা বলেছি। এরপর তোমারাও যারিনার মাও তো আমাকে কিছু কথা বলেছে। তুমি শুধু আমাকে এতটুকু বলো, বিয়ের আগে তুমি এত সজীব প্রাণ ছিলে আর বিয়ের পর এত চুপসে গেলে কেন? এমন সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে তুমি কোন অসুখে পড়লে?'

'আমি ওকে হত্যা করিনি। হত্যা করলে তো বিয়ের প্রথম রাতেই করতাম'। কোন ক্রুদ্ধ মূর্তি যেন ইকবালের ভেতর থেকে বলে উঠলো।

'কেন? প্রথম রাতেই হত্যা করার কথা কেন মনে হলো?'

তার বুক থেকে হাহাকার বেরিয়ে এলো। যেন সেখানে এক নদী দুঃখ জমাট বেধে আছে। তার মাথাটি সামনের দিকে নুয়ে পড়লো। আমি তাকিয়ে রইলাম। তারপর যখন মাথা উঠালো মনে হলো অনেক কষ্টে বড় এক বোঝা উঠাচ্ছে। চোখ গুলো রক্ত বর্ণ হয়ে উঠলো। তার সুন্দর মুখটা ছেয়ে গেলো বিমর্ষতার কালো ছায়ায়।

'আমি দুর্বল ছেলে নই'– যেন তাল হারানো গলায় কথা বলছে ইকবাল– 'আর আমি জানতাম না, দুঃখ আর হতাশ কাকে বলে? আমার এলাকার মেয়েরা

তো আমাকে তৃষ্ণকাতর নয়নে দেখতো। অথচ বিয়ের প্রথম রাতেই আমার নববধু আমাকে স্পষ্ট বলে দিলো, আমার কাছে আসবে না। আমি অন্তর থেকে তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করিনি। না, ভীত অনুতপ্ত গলায় সে একথা বলেনি। বড় স্পর্ধিত গলায় হুকুমের সুরে বলেছিলে। তোমার হাত দুটি পেছনে রাখো...

'বিয়ের আগে আমাকে সবাই বলেছে, তুমি যে বউ পাচ্ছো সে এতই চুপচাপ থাকে যে, লোকে তাকে বোবা বলে। অথচ সে বোবা মূক মেয়েটি আমাকে বোবা বানিয়ে দিলো। লোকে যে আমাকে নির্ভীক সাহসী ছেলে বলে জানতো আমার সেই নির্ভীকতা কোথায় যেন চলে গেলো। আমি টলমলে পায়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মন মগজ সব আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। যে ছেলে নিজেকে শাহজাদা মনে করতো। মেয়েরা যার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে যেতো। তাকে এক মেয়ে বলছে, আমার কাছে আসবে না। সে তো বরফের সঙ্গে গলে পানি হয়ে যাবে। অথবা আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠবে। না হয় সে আত্মহত্যা করবে বা বিপক্ষকে গলা টিপে মারবে। আমার মনে হলো, আমি বরফের মতো গলে গলে পানি হয়ে যাচ্ছি......।

'কথা বলার মতো কোন শক্তি আমার মুখে জোগলো না। সে ভেবেছে, আমি রাগ সামলাতে গিয়ে কথা বলতে পারছি না। সে বললো, তুমি পুরুষ আমি দুর্বল এক মেয়ে। আমাকে মারো, খুন করো, কিন্তু তোমার স্ত্রী হবো না। তুমি জোর করে স্ত্রী বানাতে চাইলে তোমার সঙ্গে লড়াই করে পারবো না আমি। কিন্তু মনে রেখো, তোমার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ ছড়িয়ে দিবো যে, সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না......।

'আমি জানাতাম, মেয়েরা যদি বদনাম রটিয়ে দেয়, আমার স্বামী পৌরষত্বহীন তাহলে সে পুরুষ আর কারো সামনে মুখ খুলতে পারে না। ওকে অমি অনেক কিছু বললাম। বুঝালাম যে, সে বিয়ের শুরুতেই কেন অস্বীকার করলো না। এখন তো সে আইন সম্মত স্ত্রী।

সে বললো, অমি পালাবো না। তোমার ঘরেই থাকবো, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর কোন সম্পর্ক রোখবো না।

এতক্ষণ সে ঘোমটা মুখে রেখেই কথা বলছিলো। তারপর সে তার মুখের ঘোমটা সরালো। রূপের এক তীব্র ধাক্কায় যেন আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। সাধারণ চেহারার কেউ হলে না জানি আমি কি করতাম। কিন্তু ওর রূপ আমাকে জীবন্ত লাশ বানিয়ে দিলো.....।

'আমি ওকে বললাম, আমি তো এতো কুৎসিত নই যে, আমাকে দেখে তোমার ঘৃণা উপচে পড়ছে। সে বললো, কে বলেছে তোমাকে আমি ঘৃণা করছি। তুমি তোমার এলাকার শ্রেষ্ঠ রূপদর্শন ছেলে। তোমাকে দেখে যে কোন মেয়ের মনে শিহরণ জাগবে। কিন্তু তুমি আমাকে যেভাবে গ্রহণ করেছো আমি তোমাকে সেভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। যদি আমাকে 'তালাক' দিয়ে দাও তোমার ওই অনুগ্রহ সারা জীবনেও আমি ভুলবো না....।

'আমি একথার কোন জবাব দিলাম না। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই ভাগ্যবান কে যার কারণে তুমি আমার পৌরুষত্বে লাথি মারছো?

সে বললো, এটা তো আমি কখনেই বলবে না...... নরক বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার রাতটা কাটলো। সকাল বেলা মনে হলো সমস্ত দুনিয়া আমার চোখের সামনে দুলছে।'

'তুমি কি তোমার মা বাবাকে এসব কথা জানাওনি?'

'না, জানাইনি। যদি এর কারণ জিজ্ঞেস করেন আমি কোন সদুত্তর করতে পারবো না। মনে হচ্ছিলো ঐ মেয়ে যেন আমাকে বশীকরণ তাবিজ করেছে। আপনি পুরো গ্রামে জিজ্ঞেস করেন। আমি কেমন সাহসী ছেলে ছিলাম। কিন্তু ঐ মেয়ের সামনে আমার সব বীরত্ব উধাও গলো। বন্ধুরা ঠাট্টাচ্ছলে রসিকতা করে আমাকে জিজ্ঞেস করে, প্রথম রাত আমার কেমন কেটেছে। আমি বড় কষ্টে জবাব দেই, ভালো কেটেছে।'

জাদুটোনা সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলে। কেউ একে বিশ্বাস করে আবার কেউ অস্বীকার করে। কিন্তু বিদ্যার অস্তিত্ব ও এর বাস্তবতা যে আছে এটা পরীক্ষিত সত্য। তবে এর প্রতিক্রিয়া ভালোমন্দ দুটোই হতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শত্রুর বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করে। এ ধরনের দুটি মামলা আমার কাছে অনেক দিন আগে এসছিলো। ইকবালের বিশ্বাস যে, যারিনা তার ঘরে আসার আগেই তাকে জাদু করেছে। এ কারণেই তার মতো টগবগে এক যুবক এক মেয়ের সামনে বরফ হয়ে গেছে। ওর মাথায় যারিনার বিরুদ্ধে আর কিছুই খেললো না।

সেই কথা বলে যাচ্ছিলো আর আমি অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছিলাম যে, সে শেষ এটা স্বীকার পর্যন্তরিনাকে যে হত্যা করেছে করবে বা সে নিজেই যারিনাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। সে এখন তার পছন্দের লোকের কাছে আছে।

'আচ্ছা! তুমি কি শেষ পর্যন্ত জানতে পেরেছো। যারিনা কাকে ভালোবাসতো?– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি অনেক জানতে চেষ্টা করেছি, এ তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি। আর গ্রামের লোকেরা ওকে অত্যন্ত ভালো মেয়ে বলে জানে'– ইকবাল বললো।

'তোমাদের এখানে থাকাকালে কোন রাতে কি এমন হয়েছে যে, যারিনা বিছানা থেকে উঠে এমনিই বাড়ি ঘর ঘুরে ঘুরে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে?'

'না জনাব!– ইকবাল সবিস্ময়ে বললো– এমন তো কখনো হয়নি? আপনি একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

আমি এ প্রসঙ্গে এড়িয়ে গেলাম। যারিনার গুম হওয়ার ঘটনা এর সঙ্গে কতটুকু সম্পৃক্ত– এ বিষয়ে আমি নিজেই অস্পষ্টতার মধ্যে ছিলাম।'

*** *** ***

কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার শুরু করলাম। ওকে সহজে ছেড়ে দিলাম না। ওকে শক্ত জেরা করলাম, সে যারিনার বিরুদ্ধে কিছু একটা অবশ্যই করেছে। ওকে শক্ত করে জেরা করলাম, সে যারিনার বিরুদ্ধে কিছু একটা অবশ্যই করেছে।

'আমার মধ্যে নতুন এক মানসিক ব্যধি দেখা দিলো– ইকবাল এবার আরো সরল কণ্ঠে বললো–

'আমি কাউকে কিছু বলতে লজ্জা পেতাম। যারিনার ওপরও কোন জোর খাটালাম না। ছয় সাত দিন পর আমি আমাদের পীর সাহেবের কাছে গেলাম। তার পায়ে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে তাকে বললাম, আমার স্ত্রী অন্য কারো বশ মেনে নিয়েছে। এজন্য সে আমাকে স্বামী বানাতে আগ্রহী নয়। আর সে আমার ওপর এমন তাবিজ করেছে যে, ওর সামনে আমি কিছুই বলতে পারি না।

পীর সাহেব বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি বললাম, ইয়া পীর দস্তগীর! সে কখনো আসবে না। সে বুঝে ফেলবে, আমি ওর মনকে ওর প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে আমার অধীনে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। পীর সাহেব বললেন, ঠিক আছে, ওকে আনতে হবে না। আমিই তোমাদের ঘরে চলে আসবো.......

'সেদিন সন্ধ্যায় পীর সাহেব আমাদের ঘরে এসে হাজির। আমি তো আনন্দে গদগদে হয়ে গেলাম। আমার সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেছে। আমার পীর আমার ঘরে চলে এসেছেন। তিনি যারিনাকে এটা টের পেতে দিলেন না যে, তারই মাথা ঠিক করতে তিনি এসেছেন।

তিনি যারিনার মাথায় হাত রেখে তাকে পাঁচ টাকা সালামী দিয়ে বললেন, আমি চিল্লায় বসেছিলাম। তাই এতদিন পর নব দুলহানকে মোবারকবাদ ও

সালামী দিতে এসেছি। তিনি কিছু একটা পড়ে যারিনার সারা দেহে ফুঁক দিলেন এবং যারিনাকে আরেকটু কাছে নিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, তোমার চোখে আমি তোমার দুশমনের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

যারিনা কিছুই বললো না। পীর সাহেব একটি তাবিজ লিখে পানিতে মিশিয়ে যারিনাকে খাইয়ে দিলেন। তিনি যারিনাকে অনেক ভয় দেখালেন, শত্রুর এই ছায়া কখনো কখনো অনেক ভয়াবহ রূপ নিয়ে থাকে......

'পীর সাহেব যারিনার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। রাতে যারিনা আমাকে বললো, পীর সাহেবকে যদি তুমি ডেকে এনে থাকো, তাহলে তার তাবিজ আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি মিথ্যা বললাম, না পীর সাহেবকে ডাকিওনি এবং তার সঙ্গে আমার কোন কথাও হয়নি।'

'সে কি তোমার সঙ্গে রাগ দেখিয়ে কথা বলতো? ঝগড়া বিবাদ করতো?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না জনাব! অনেক শান্ত ও মার্জনীয় ভঙ্গিতে কথা বলতো।'

ইকবাল যে পীরের কথা বলেছে, সে পীরের কাছে তাদের পুরো বংশ ও এলাকার সবাই তার মুরিদ। হেন কাজ নেই যা পীরের খানকায় ঘটে না। তার এক জোয়ান ছেলে আছে। খেয়ে খেয়ে অপদার্থ থেকে লাল মহিষে পরিণত হয়েছে। আমি যখন এই থানায় নতুন আসি তখন থানার এক হিন্দু আই. এস. আই আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, পীরের ঐ ছেলে এক নম্বর মেয়ে শিকারী। কিন্তু পীরের ছেলে বলে লোকে চুপ থাকে।

একদিন নিজ এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে সেই পীরের আস্তানায়ও ঢু' মেরে আসি। আগের থানা অফিসারের সঙ্গে পীরের খুব দরহম মরহম ছিলো। পীর আমাকেও সে ধরনের অফিসারই মনে করলো। আর আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো। যেন এ এলাকার হুকুমত তার হাতে।

আমি আর তাকে বেশি বাড়তে দিলাম না। তার কানে বোমা ফাটিয়ে দিলাম। পরিস্কার ভাষায় বলে দিলাম, এই এলাকার হাকিম আমি এবং সে তার ছেলেকে যেন লাগাম পরিয়ে রাখে। পীর সাহেব প্রথমে তার মৃত পূর্ব পুরুষদের ক্রোধান্বিত আত্মার ভয় দেখালো। কিন্তু তার মাথা থেকে হুকুমতের ভূত আর শাহেনশাহী আমি নামিয়ে দিলাম।

'এই ছেলেটি আমার বড় বেততমিজ হয়ে গেছে– পীর তখন আপসরফার সুরে বললো– আমার নিজের ঘরও তো তার হাত থেকে নিস্তার পায় না। আপনাকে সত্য করে বলছি, এই ছেলের সঙ্গে আমার কথা বার্তাও বন্ধ। আমার

ও গদির মান সম্মানের ব্যপারে না হলে ওকে আমি অনেক আগেই ঘর থেকে বের করে দিতাম।'

ইকবাল আবার বলতে শুরু করলো– দুদিন পর আবার আমাদের বাড়িতে পীর সাহেব এলেন। যারিনাকে কাছে বসিয়ে তার চোখে চোখ রেখে বললেন, বড় বিষ ছায়া পড়েছে তার ওপর। পীর সাহেব তখন আমাকে ঘর থেকে বের করে দেন। তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয় সেটা আজো পর্যন্ত জানতে পারি নি আমি। পীর যারিনাকে আরেকটি তাবিজ পানিতে গুলিয়ে পান করান এবং চলে যান......

'আমি নিয়মিত পীর সাহেবের দরবারে সালাম জানাতে থাকলাম। পীর সাহেব বলতেন, মেয়ের ওপর যে তাবিজ করা হয়েছে এর আছর যতদিন থাকবে ততদিন ঐ মেয়ে কাউকে স্বামী বলে মেনে নেবে না। আমি উনাকে খুশী করতে বহু চেষ্টা করে বললাম, যেভাবেই হোক এই আছর আপনি দূর করে দিন। তিনি বলতেন, দূর হয়ে যাবে, তবে সময় লাগবে......

'এর কিছু দিন পরই যারিনা লাপাত্তা হয়ে যায়। আমি ছুটে পীর সাহেবের কাছে গেলে তিনি বললেন, আমিও এই ভয় পাচ্ছিলাম। তার ওপরের ছায়াটা বড় ভয়ংকর ছিলো। সেটাই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি বললাম, ইয়া পীর ও মুরসিদ! ওকে ফিরিয়ে আনুন।

পীর সাহেব বললেন, এখন যদি ও ফিরে আসে তাহলে তোমার বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। সে তোমার স্ত্রী হবে না তখন কোনদিন। আর ওকে খুঁজতে যেয়ো না কোথাও। থানায়ও যেয়ো না। তাহলে কিন্তু সবাই মারা পড়বে।'

'তাহলে থানায় আসলে কেন?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার বাবা ও যারিনার বাবা আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি এজন্য চুপচাপ ছিলাম যে, আমার পীর ও দস্তগীর আমাকে নিষেধ করেছেন থানায় আসতে।'

'তুমি কি বউ ফিরে পেতে চাও?'

'কি করবো ওকে নিয়ে? পীর সাহেবের শক্তিতে যদি আসে তাহলে তো খুব ভালো। আর আপনি যদি ওকে কারো কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন তাহলে ও' আমার কি কাজে লাগবে?'

ইকবালের কথায় পীরকেও এই মামলায় সন্দেহভাজনদের তালিকায় নিয়ে এলাম। কিন্তু এখনই তাকে ঘাটাতে চাইলাম না। কারণ, পীর এতো কাঁচা লোক নয় যে সহজে আমার জালে জড়িয়ে যাবে।

আগে আমাকে সাক্ষীর জাল বুনতে হবে তারপর পীরকে জাল দিয়ে ধরতে হবে। কিন্তু এখন আমার চিন্তার বিষয় হলো, যারিনা কাকে পছন্দ করবো সেটা আগে খুঁজে বের করা।

*** *** ***

পরে তিনদিন আমি আর এই মামলার দিকে মনোযোগ দিতে পারলাম না। হত্যার এক মামলায় সেশন কোর্টে আমি সাক্ষী ছিলাম। দ্বিতীয় দিনও আরেকটি মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তৃতীয় দিন থানারই অন্য আরেক কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সেশন কোর্ট আমার থানা থেকে আঠাশ মাইল দূরে। কিদার নাথ শির্মা নামে সেশন কোর্টের এক পি,পি (সরকারী ওকিল) এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিলো। লোকটা এসব ব্যপারে অভিজ্ঞও খুব।

আমি শর্মাকে যারিনার ঘটনা শোনালাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম এমন কি হতে পারে, ঘুমের মধ্যে ঐ মেয়ে বাইরে চলে গেছে?'

'এমন হলে আশ্চর্যের কিছু নয় এটা– শর্মা বললেন– ঐ মেয়ে সমসময় চুপচাপ থাকতো। কে জানে ওর মনে কত কিছুই তো গোমট হয়ে থাকতে পারে। সে কিছু বলতো না এবং আবেগও প্রকাশ করতে পারতো না। সে থাকতো কল্পনার জগতে। এ ধরনের মানুষ ঘুমের মধ্যে কথা বলে অথবা উঠে চলা ফেরা করে। ঘুমের মধ্যে সে এমন জায়গায় যায় যেখানে জাগ্রত অবস্থায় যেতে পারে না। এটা একেবারেই মানসিক ব্যধি........

'আমার মনে হয়, ঐ মেয়ের পছন্দের বাইরে বিয়ে হওয়াতে সে তার স্বামীকে মেনে নিতে পারেনি। তবে স্বামীর ঘরে সে বন্দিনীর মতো ছিলো। এজন্য ঘুমের মধ্যে তার চলাফেরার রোগটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এবং সে রাতে বের হয়ে পড়ে, হয়তো ক্ষেত খামার দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। কেউ দেখে ফেলেছে এবং এমন রূপবর্তী মেয়ে হাতছাড়া না করে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।'

যদি পিপি কিদারনাথ শর্মার ধারনা মতে যারিনা হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ মামলায় আমার জন্য সফল হওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমি এটা মাথায় রেখে যারিনার প্রেমিক কে তা খুঁজে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার বিশ্বাস, যারিনা গেলে তার কাছেই গিয়েছে।

যারিনা গুম হয়েছে পাঁচ দিন চলে গেছে। থানায় বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানকারী লোকজন ও থানায় আসা যাওয়া আছে দুই গ্রামের এমন প্রভাবশালী লোকদের কাছ থেকে যারিনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তার মুল কথা হলো, যারিনা অত্যন্ত ভালো সতী স্বাধী ও শান্ত মেজাযের মেয়ে।

যারিনার গ্রামের চৌকিদারের বউ স্বচ্ছল বাড়িগুলোতে কাজ করে। একেও আমি গোপনে খবর আদান প্রদানের জন্য লাগিয়ে রেখেছিলাম।

চৌকিদার তার বউ থেকে খবর নিয়ে আসে যে,

আব্বাস নামে যারিনার এক মামত ভাই আছে। তেইশ চব্বিশ বছরের মোটামুটি চেহারার এক ছেলে। ওর মা নেই। দুটি বোন আছে। ওরাই ঘর সামলে রাখে। যারিনাদের ঘরে আব্বাসের বেশ যাতায়াত ছিলো। যারিনার মাও তার ভাইয়ের ছেলে আব্বাসকে একটু বেশিই খাতির যত্ন করতো।

'যারিনা অন্য কারো ঘরে যেতো না– চৌকিদার জানালো– 'ও শুধু ওর মামার বাড়িতেই যেতো। আমার বউ আগেও দেখেছে, যারিনা আব্বাসকে দেখে চমকে উঠতো। ওর সঙ্গে যত কথা বলতো অন্য কারো সঙ্গে এত কথা বলতো না। আব্বাসের বোনরাও যারিনার সঙ্গে বান্ধবীর মতো মিশতো। আমার বউ যারীনা ও আব্বাসকে একই খাটে বসা অবস্থায় দেখেছে।'

আমি তখনই চৌকিদারকে তার স্ত্রী ও যারিনার মাকে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম। আমি এটা আদৌ মানতে পারছিলাম না যে, আব্বাস যারিনাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে। এ ক্ষেত্রে ওদের মা বাবা কেউ এ অনুমতি দেবে না যে, যারিনাকে বিবাহিতা অবস্থায় আব্বাস নিজের বাড়িতে রাখুক।

চৌকিদার সময় মতোই যারিনার মা ও তার বউকে নিয়ে এলো। যারিনার মাকে অন্য ঘরে বসিয়ে চৌকিদারের বউকে অফিস ঘরে বসালাম এবং যারিনা সম্পর্কে যা যা জানে সব জানাতে বললাম।

'যারিনা আব্বাস ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতো না'– চৌকিদারের বউ বললো– 'আব্বাসের ঘরে আমার যাতায়াত অনেক দিনের। আব্বাসের বোনদেরকে আমার খুব ভালো লাগে, ওরা আমাকে বেশ খাতির যত্ন করে। এজন্য ওদের ঘরের কাজও করি মন প্রাণ দিয়ে। ওখানে থাকাও হয় বেশি। তাই আব্বাস ও যারিনাকে আমি ওখানে যেভাবে দেখেছি আর কারো তা দেখার কথা নয়।

ওদেরকে আমি খাটের ওপরও বসা দেখেছি কয়েকবার। যারিনা তো এমনি চুপচাপ স্বভাবের ছিলো। কিন্তু আব্বাসকে দেখলেই গোলাপের পাপড়ির মতো ফুটে উঠতো। মুখের ভাষা মধু হয়ে ঝরতো। যারিনা কয়েকবার আমাকে গোপনে– যাতে কেউ না জানে– সেভাবে আব্বাসকে ওদের বাসায় পাঠাতেও বলেছে।'

'বিয়ের পর ওদেরকে এক সঙ্গে দেখেছো তুমি?'

'যারিনা তো এক মাসের মধ্যে তিন চার বার বাড়িতে এসেছে– চৌকিদারের বউ বললো– এর মধ্যে দু'বার ওদেরকে এক সঙ্গে দেখেছি। উভয়ের

চোখে মুখে তখন স্পষ্ট হতাশার ছাপ ছিলো। একবার তো যারিনার চোখে পানিও দেখেছি।'

এই মহিলার কথায় আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যারিনার প্রেমিক তার মামত ভাই আব্বাস।

'পীর সাহেবকেও আমার সন্দেহ হয়'– চৌকিদারের স্ত্রী বললো– 'পীরের খানকায় কি হয় না হয় তা তো আপনি জানেনেই। তবে পীর আমার প্রতি খুব মেহেরবান। তিনি একদিন আমাকে লোক মাধ্যমে ডাকিয়ে বললেন, যে কোন ছুতোয় যারিনার শ্বশুর বাড়ি যাও। যারিনার কানে কানে বলো, তোমার স্বামী পীর সাহেবকে দিয়ে তোমাকে তাবিজ করাতে চায়।

কিন্তু পীর সাহেব তা করতে চান না। যে তাবিজ তোমাকে পান করানো হয়েছে সেটা তাবিজ ছিলো না, সাদা কাগজ ছিলো। তাই তুমি যেকোন দিন পীর সাহেবের কাছে চলে যাও, তিনি তোমাকে এমন তাবিজ দেবেন যে, ইকবাল তোমাকে তালাক দিয়ে দেবে। আর তোমার প্রেমিকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে.......

'খোদার মেহেরবাণীতে আমার আর ওদিকে যেতে হয়নি। যারিনাই দুদিন পর ওদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। সুযোগ বুঝে ওকে আমি পীরের পয়গাম দিলাম।'

যারিনা সব শুনে বললো,

'পীর সাহেবকে বলবে, আপনি এমনিতেই আমার প্রতি অনেক মেহেরবানী করেছেন, আপনি যদি তালাক দেওয়াতে পারেন এবং অন্যের সঙ্গে বিয়েও পরানোর শক্তি রাখেন তাহলে আমাকে ছাড়াই আপনি একাজ করতে পারবেন। যদি আপনি এটা সত্যিই করে দিতে পারেন তাহলে আপনি যা বলবেন এর চেয়ে বেশি নজরানা পাঠিয়ে দেবো আপনার পদ মোবারকে।'

'আমি পীর সাহেবকে যারিনার জবাব শুনিয়ে দিলাম– চৌকিদারের বউ– বলে গেলো। তিনি বললেন, ওকে বলো গিয়ে ওকে ছাড়া এই তদবির সম্ভব নয়। পরদিন সকালে যারিনাকে পীরের দ্বিতীয় পয়গাম শুনিয়ে দিলাম।'

'আরে আমি যদি এ ধরনের মেয়ে হতাম তাহলে ইকবালের চেয়ে সুপুরুষ আর কে আছে? অথচ ইকবালকেও আমি জবাব দিয়ে দিয়েছি। আমি আর কারো কাছে যেতে পারবো না। এত বোকা নই আমি।'

'এর কিছু দিন পরই যারিনা লাপাত্তা হয়ে গেলো।'

পীর যারিনার কথা শুনে কি বললো?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পীর সাহেব মাথা দুলিয়ে বলেছিলেন, এসে যাবে।'

*** *** ***

চৌকিদারের স্ত্রীকে ওয়েটিং রোমে পাঠিয়ে দিলাম। একটু একাকি ভাবতে বসলাম। আমার সামনে এখন দু'জন মানুষ, পীর ও আব্বাস। আব্বাসের ব্যপারে আমি পরিষ্কার।

সে যারিনাকে তার ঘরে রাখতে পারবে না। আমি চৌকিদারকে ডেকে আব্বাসের ওপর সবসময় নজর রাখতে বললাম। সে যে দিকেই যায় তার যেন পিছু নেয়। গভীর রাতেও যদি আমাকে জানানোর মতো কোন কিছু ঘটে তাহলে যেন আমাকে এসে জাগিয়ে তোলে।

ওর বউকে আবার ডাকলাম ভেতরে। বললাম, তুমি আব্বাসের ঘরের ভেতর নজর রাখবে। আর পীরের কাছেও যেন যাতায়াত অব্যহত রাখে। আর চোখ কান এমনকি নাকের ঘ্রাণ শক্তিও যেন কাজে লাগিয়ে দেখে, ওখানে যারিনার গন্ধ পাওয়া যায় কিনা।

কোন এক দৈব ইশারায় পীরের ওপরই কেন জানি আমার সন্দেহ বাড়ছিলো। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পীরের যে প্রভাব ছিলো সেটা জাদুর চেয়েও তীব্র ছিলো।

এজন্য পীরের আস্তানায় প্রমাণ ছাড়া হানা দেয়া সহজ কাজ ছিলো না।

ঝুলিতে সাক্ষ্য প্রমাণ না নিয়ে পীরের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিলো না। এজন্য আব্বাসের বউ ছাড়াও কয়েকজন গুপ্তচর পীরের আস্তানায় লাগিয়ে দিলাম। আব্বাসের গতিবিধির ওপর চোখ রাখার জন্যও গুপ্তচর নিযুক্ত করলাম।

যারিনার মা একা আসেননি। সঙ্গে তার স্বামীও ছিলো। মা কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে ঢোকেন। চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করেন।

'আমার মেয়ের কোন খবর পেলেন ইনস্পেক্টর সাব?'

'আগে বসুন মা জী!– আমি সান্তনার সুর ফুটিয়ে বললাম– 'আল্লাহ্ বড় সাহায্যকারী। কিন্তু আপনি সব ব্যপার খুলে বললে আপনার মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পারবো.......

আমাকে শুধু এতটুকু বলুন, ও কাকে পছন্দ করতা? সে যখন আপনাকে বলেছিলো আমাকে বিয়ে করাবেন না, তারপর এও বলেছিলো, ইকবালের সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেবেন না। তখন তো নিশ্চয় আপনি বুঝেছিলেন, ও নিজ পছন্দে বিয়ে করতে চায়।'

যারিনার মার ঠোঁট দু'টো ফাঁক হলো মাত্র। কিছু বলতে পারলেন না। আমি তার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। তারপর তার মাথাটি এমনভাবে নিচু করলো

যেন অচেতন হয়ে ঢলে পড়ছে। সম্মান ও অভিজাত্যবোধ তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। তার মেয়ে অন্য কাউকে পছন্দ করতো এ কথটা বের করতে তার কণ্ঠ চিড়ে যাচ্ছে।

'আপনি যে কথাটা বলতে সংকোচ বোধ করেছেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি– আমি প্রত্যয়ের গলায় বললাম– 'ও আব্বাসকে পছন্দ করতো.........

আব্বাস আপনার ভাই পুত্র না? .... মুখ খুলুন। আড়াল করবেন না কিছু। আপনার মেয়ে ফিরে পেতে চাইলে আড়াল করবেন কিছুই।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। ও আমাকে এও বলেছিলো, আমার বিয়ে আব্বাসের সঙ্গে দিন– কথাটা বলতে পেরে যেন যারিনার মা একটু আরামবোধ করলেন।

'তাহলে দিলেন না কেন?'

'আমার মতামত চললে তো যারিনা আব্বাসের ঘরেই যেতো। কিন্তু যারিনার বাবা ওর ঘোর বিরোধী। আমার ভাই সম্পর্কে তার ধারনা খুব উঁচু নয়। বিয়ের আগে তিনি বলেছেন, ইকবালের পরিবার ধনে মানে অনেক বেশি আমির ঘরনার।

তাছাড়া দেখতে শুনতে ইকবাল আব্বাসের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয়। তারপরও যারিনার মামাকে বলেছিলাম, যারিনার বাপকে যেভাবেই হোক খুশি করে আব্বাসের জন্য যারিনাকে চেয়ে নাও। কিন্তু আমার ভাই যারিনার বাপকে কিছু বলাটা নিজের জন্য অপমানজনক মনে করতো।'

যারিনার মা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন, যারিনা আব্বাসকে শুধু ভালোই বাসতো না, তাকে একটা দিন না দেখলে যেন তার প্রাণের সাড়া পেতো না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই পারিবারিক নীতি ব্যক্তি স্বার্থের শৃংখলে এমনভাবে বন্দি যে, নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সন্তানের ইচ্ছাকে গলা টিপে হত্যা করে।

যারিনার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমনকি হতে পারে যে, ইকবালের কাছ থেকে পালিয়ে যারিনা আব্বাসের কাছে চলে এসেছে। কথাটা যেন তার সহ্য হলো না। দুই কান চেপে ধরলেন। তারপর বুদ্ধিমানের মতো একটা উক্তি করলেন।

'যদি ওর স্বামীর ঘর থেকে ও পালাতোই তাহলে তো বিয়ের আগেই আব্বাসের সঙ্গে পালিয়ে যেতো। হায়! আমার মেয়ের ওপর এত বড় জুলুম হলো অথচ আমি কিছুই করতে পারলাম না। আর করারই বা ছিলো কি আমার?'

'যারিনা আপনাকে মনে হয় বলেছে, ইকবালের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন? ওদের মধ্যে কোন হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল?'

'হৃদ্যতা? ও যখনই আসতো। কান্না ছাড়া আর কিছু শোনাতো না।'

'ওর সঙ্গে ইকবালের এবং ইকবালের সঙ্গে ওর ব্যবহার কেমন এসবও কি আপনাকে জানাইনি যারিনা?'

'না কখনেই বলেনি' তার গলায় চিন্তা ক্লিষ্টতা।

উনাকে বাড়ি পঠিয়ে দিলাম।

*** *** ***

আজ সারাটা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেলো। তাই বিছানায় যেতেই গভীর ঘুম। কতক্ষণ পর জানিনা, সজোরে দরজায় কড়াঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গলো। দরজা খুলে দেখি, যারিনাদের গ্রামের চৌকিদার।

'জনাব! ক্ষমা করবেন– হাতজোড় করে বললো– জরুরী একটা খবর এনেছি। আমি গাঁয়ে টহল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ কাউকে স্ববেগে দৌড়ে গ্রামের দিকে আসতে দেখলাম। আমি পথের পাশে আড়াল নিয়ে লুকিলে পড়লাম। চাঁদের আলো তখন আবছা মেঘে ঢাকা........ কিছুই দেখা যায় না।...

'তবে মানুষ দেখা যায়। দৌড়াচ্ছিলো কোন এক নারী। ওর হাতে একটি কুড়াল উদ্বত অবস্থায় ধরা ছিলো। আমাকে সে দেখেনি। আমার কাছ ঘেষে দৌড়ে গেলো। চিনতে পারলাম না ওকে।

আমি ওকে অনুসরণ করার জন্য একটি ঘরের পেছনে দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। আমার ছুটন্ত পায়ের শব্দ মনে হয় শুনে ফেলেছিলো। সে একবার পেছন ফিরে দেখে নিলো। তারপর আবার দৌড়ের গতি তীব্র করে তুললো। আমি এবার এমন জায়গায় গিয়ে ওর ওপর চোখ রাখলাম যেখান থেকে ওকে সহজে দেখা যায়।

নারী মূর্তি আব্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দরজায় আওয়াজ দিলো। দরজা খুলে গেলো এবং সে ভেতরে চলে গেলো.......

'ও যদি স্বাভাবিক গতিতে হেটে আসতো আমার সন্দেহ হতো না। সে উর্ধ্বশ্বাস দৌড়াচ্ছিলো এবং তার হাতে ছিলো একটি কুড়াল।'

আমি ঘড়ি দেখলাম। আজো সেই স্মৃতি উজ্জল হয়ে আছে। তখনো এগারটা বাজেনি। কয়েক মিনিট বাকি ছিলো।

থানা থেকে ওদের গাঁ দেড় কি পৌনে দুই মাইল। আমি কোয়ার্টার থেকে রাত পোহালেই থানায় চলে গেলাম। একজন হেড কনেস্টবল ও তিনজন কনেস্টেবল নিয়ে সাইকেল রিক্সায় করে রওয়ানা হয়ে গেলাম। সঙ্গে প্রয়োজনীয়

অস্ত্রপাতিতো ছিলোই। মূল সড়ক পথে না গিয়ে গ্রামের ভেতরের সংক্ষিপ্ত পথে এগুলাম। চৌকিদার সাইকেল নিয়ে আসেনি। তাই সে দৌড়ে আসছিলো।

গ্রামের বাইরে থাকতেই সাইকেল ছেড়ে দিলাম। সারা গ্রাম এমন নিথর নিঃশব্দ যেন কোন মৃত্যুপুরীতে ঢুকেছি। আমরা আব্বাসের বাড়ি চিনতাম না। চৌকিদারের জন্য অপেক্ষা করতে হলো। বেচারা দৌড়াতে দৌড়াতে আসায় তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। সে আমাদেরকে আব্বাসদের বাড়ির সামনে নিয়ে গেলো।

আমি সজোরে দরজায় করাঘাত করলাম। কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। দুই কনস্টেবলকে বাড়ির পেছন দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আবার করাঘাত করলাম। না, এবারও সারা মিললো না। চৌকিদারকে বললাম, আব্বাসের বাপকে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলো, থানার ওসি সাহেব এসেছে, দরজা খোলো। না হয় তোমার ছেলেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

চৌকিদারের আওয়াজ ভেতের পৌঁছতেই দরজা খুলে গেলো। দরজার মুখে এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে। চৌকিদার জানালো, এই লোকই আব্বাসের বাবা।

'তোমাদের বাড়িতে যে কুড়াল হাতে একটি মেয়ে এসেছে ওকে হাজির করো'– আমি হুকুম করলাম।

লোকটি দাঁড়িয়ে রইলো অথর্বের মতো। পূর্ণবার আমি হুকুম করলাম। লোকটি তখন আমার হাত জড়িয়ে ধরলো।

'আপনি ভেতরে আসুন– লোকটি বললো– 'যে এসেছে সে আমার ভাগ্নি যারিনা। কি করবো না করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আপনি ভেতরে এসে দেখুন।'

আমি ভেতরে চলে গেলাম। প্রশস্ত উঠনো আরকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি চিনি। তিনি ছিলেন যারিনার বাবা। যারিনার বাবা আমাকে বাড়ির বড় একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে যারিনার মা দাড়িয়ে আছেন স্থানুর মতো। আরো তিনজন ছেলে তিনজন মেয়েও দাঁড়িয়ে ছিলো।

ওদের পরিচয় দেয়া হলো, দু'জন যারিনার ভাই, অপরজন আব্বাস। ইকবালের মতো সুপুরুষ না হলেও বলবান এক আকর্ষণীয় যুবক আব্বাস। মেয়েদের মধ্যে দু'জন আব্বাসের বোন। আর তৃতীয় জন যারিনা। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটি। তবুও রূপের বিচ্ছুরণ ইহা সারা ঘরকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে।

আমি চৌকিদারকে বললাম, এলাকার সাধারণ প্রহরী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মেম্বারকে নিয়ে এসো। সঙ্গে দু'জন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিকেও নিয়ে আসতে বলবে।

কথামতো কাজ করা হলো। চারপাঁচজনের একটা দল আসলে ওদেরকে বড় কামরায় নিয়ে আসা হলো।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি হারিয়ে যাওয়া মেয়ে যারিনাকে চিনে কিনা। সবাই তাকে চিনে বলে সনাক্ত করলো। আমি মেয়ের উপস্থিতিতে লিখিত রিপোর্টের ব্যবস্থা করে সবাইকে থানায় আসতে বললাম। কারণ, এখানে আমি শুনানির কাজ শুরু করতে চাইলেও সে পরিবেশ ছিলো না।

চৌকিদার যখন মেম্বারকে আনতে গিয়েছিলো, তখন আমি যারিনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। কিন্তু ভয় তাকে এমনভাবে চেপে ধরেছিলো যে, সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই বলতে পারলো না। অবশ্য এই শোচনীয় অবস্থা অন্যদেরও কম নয়। তাই জবানবন্দি শোনার জন্য থানাই উপযুক্ত জায়গা।

থানায় গিয়ে আব্বাস ও যারিনাকে আমার অফিসে বসালাম। যদিও ওদের আলাদা আলাদা জবানবন্দি নেয়া উচিত। কিন্তু মেয়ে যেহেতু এখন উপস্থিত তাই ওদেরকে এক সঙ্গেই বসালাম। যারিনার দিকে আরেকবার লক্ষ্য করলাম। শুধু রূপই নয় অত্যন্ত আকর্ষনীয় দেহ সৌন্দর্য্যের অধিকারিনী। এমন রূপবতী মেয়ে আমি খুব একটা দেখিনি ইতিপূর্বে।

'আব্বাস! মিথ্যা বলবে না'– আমি সতর্ক করে দিলাম তবে নরম গলায়– 'তুমি ডাকতি করোনি। চুরি করোনি। পুরুষের মতো কাজ করেছো। এখন ভয় নেই। যা কিছু করেছো তুমি ভালোবাসার গভীর টানে করেছো।'

'এতটুকু বলে একটু থামলাম। ওকে নিরীক্ষণ করলাম, তারপর আবার শুরু করলাম,

'যারিনা বিবাহিত না হলে ওকে ঘর থেকে বের করে নেয়া তেমন অপরাধের কাজ হতো না। আমি তখন রিপোর্ট লিখতাম, প্রাপ্ত বয়স্কা এই মেয়ে। তাই সে নিজ ইচ্ছায় ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেছে। আইনত এই অধিকার তার আছে। কিন্তু ও তো একজনের স্ত্রী। কারো স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়া– অপহরণ করা শক্ত অপরাধ। ওর শ্বশুর বাড়ির লোকজন ভালো বলেই বলেছে' যারিনা অলংকার ও টাকা পয়সা নেয়নি। শুধু ও একলা গিয়েছে।'

আব্বাসের চেহারা দেখে মনে হলো নতুন এক আতংক ওকে গ্রাস করছে। কিন্তু যারিনার ভীত মুখে এখন লড়াইয়ের আভাস!

'আমাকে ও অপহরণ করেনি– যারিনা বলে উঠলো জোর দিয়ে– আমি নিজেই গিয়েছি।'

'তবুও এটা অপরাধ। তাছাড়া তোমাকে আমরা ওর বাড়ি থেকে আবিষ্কার করেছি।'

'আপনারা আসার একটু আগে আমি ওদের বাড়িতে ঢুকেছি'– ওর সুর ক্রমেই দৃঢ় হয়ে উঠছে।

'এতদিন কোথায় ছিলে?'

এবার যারিনাকে চিন্তাযুক্ত মনে হলো, কিছু একটা লুকোতে গিয়ে যেন বিপদগ্রস্থ।

'আমি যেখানেই ছিলাম, ওর কাছে ছিলাম না'– যারিনা বললো।

'আব্বাসকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে বলে দাও তুমি কোথায় ছিলে?– আমি প্রাথমিক অস্ত্র ব্যবহার করলাম– 'এটাও মনে রেখো, যে জায়গার কথাই বলবে এটাও প্রমাণ করতে হবে তুমি এতদিন ওখানে ছিলে। মাত্র দুটি পথ খোলা আছে তোমার সামনে। বলে দাও, কোথায় ছিলে। না হয় আব্বাসের জন্য কয়েদখানা বেছে নাও।'

*** *** ***

যারিনার ব্যপারে যা শুনেছিলাম তাই ঠিক মনে হলো। কথা বার্তায় সে খুবই অপ্রতিভ। প্রথম দিকে একটু উত্তেজিত হলেও এখন যেন আরো নিস্তেজ। এছাড়াও মনে হলো ওর মধ্যে সরলতাই বেশি।

'তুমি বলছো আমাদের পৌঁছার একটু আগে তুমি ওদের বাড়ি পৌঁছেছো'– আমি জেরার সুরে বললাম–

'তাহলে ভীত-আতংকিত হয়ে দৌড়াচ্ছিলে কেন? আর তোমার হাতে কুড়াল ছিলে কেন?'

ও কিছু বললো না।

'তুমি যদি সে মেয়ে না হও তাহলে আব্বাসকে বলতে হবে সে মেয়ে কে ছিলো যার হাতে উদ্ধত কুড়াল ছিলো? – আমি বললাম।

আব্বাস ও চুপ করে রইলো। আমি ওদেরকে চেপে ধরলাম। জেরার পর জেরা করে নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিলাম। ওরা তো কেউ পেশাদার অপরাধী নয়। তাই ভেঙ্গে পড়তে সময় লাগলো না।

যারিনা তো ঘরের চার দেয়ালের বন্দিনী। ও একেবারে কোনঠাসা হয়ে গেলো। চোখ পানিতে ভরে গেলো এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

এ সময় বাইরে থেকে কোলাহল শোনা গেলো। এক হেড কনস্টেবল দৌড়ে এসে বললো,

'স্যার! পীর সাহেব তার ছেলের লাশ নিয়ে এসেছে।

চমকে উঠার জন্য এর চেয়ে বেশি শোনার প্রয়োজন নেই।

আমি এক কনস্টেবলকে থানার নিয়ম অনুযায়ী আব্বাসদের সামনে দাঁড় করিয়ে বাইরে দৌড়ে গেলাম।

পীর আমার দিকে দৌড়ে আসছিলো। থানার সামনে একটি খাটিয়া রাখা, 'আমার বেটা!– পীর শুধু এতটুকুই বললো হাহাকার করে।

খাটিয়ার ওপর লাশ চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখটুকু শুধু উন্মুক্ত। আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। তারপর নাড়ি পরীক্ষা করলাম। অতি ক্ষীণলয়ে শ্বাস নিচ্ছিলো।

'এতো জীবিত, তবে জ্ঞান নেই'– আমি ঘোষণা করলাম।

'যখমি ছিলো তো?'– পীর চোখ বড় বড় করে বললো।

'আরে কেবলা! আপনার মাথা তো খারাপ হয়নি? ওকে এখনই সোজা হাসপাতাল নিয়ে যান'– পীরকে আমি বললাম।

আইন মতে প্রথমে ওর যখম দেখে রিপোর্ট লেখার দায়িত্ব ছিলো আমার। কিন্তু আমি বললাম, ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও, আমি আসছি। শুধু এতটুকু দেখেছি, পীরের ছেলের ঘাড়টি রক্তাক্ত কাপড়ে মুড়ানো।

হাসপাতালে তৎক্ষণাৎ পাঠানোর অর্থ এই নয় যে, ঐ গুণ্ডা ছেলের জন্য আমার দরদ উথলে উঠেছে। আমি শুধু ওর জবানবন্দি নিতে চেয়েছিলাম যে, কে ওকে মেরেছে। তারপর তার মরার খাহেশ হলে মরবে। আমার কিছু এসে যায় না।

আমার আইএসআই জগন্নাথকে তখন হাসপাতাল পাঠিয়ে দিলাম। তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো, পীরের ছেলে জ্ঞান ফিরে আসলে ডাক্তারের উপস্থিতিতে তার তাৎক্ষণিক জবানবন্দি নিয়ে নেবে।

যারিনার কেসের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তাই কাউকেও আমি একথা জিজ্ঞেস করিনি যে, পীরের ছেলের এ অবস্থা কি করে হলো? এসব দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি আইএসআইকে। এই লাইনে তার অভিজ্ঞতাও কম নয়।

আমি আব্বাস ও যারিনার প্রতি মনোযোগ দিলাম। তখন রিপোর্ট লেখক হেড কনস্টেবল এলো।

'স্যার! আপনি যে এখানে?– সে বললো– এত বড় সঙ্গীন ঘটনা। যখমিকে অনেক দূরের এক ফসলি ক্ষেত থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। কে জানে, রাত

কয়টায় উনি আক্রান্ত হয়েছেন? দেহে তো মনে হয় এক ফোটা রক্তও অবশিষ্ট নেই।'

'আরো দুইদিন ঝরলেও ওর রক্ত খতম হবে না'– কঠিন সুরে বললাম আমি– 'এরা এদের মুরিদের অনেক রক্ত চুষে খেয়েছে। তুমি এক কাজ করো' হাসপাতাল চলে যাও। জগন্নাথকে গিয়ে বলো পুরো কেসের তদন্ত যেন সেই শেষ করে আসে। আর তুমি এফ.আই.আর. লিখে ফেলো। জগন্নাথ চলে আসার পর যদি যখমির জ্ঞান ফিরে, আমাকে খবর দেবে। আমি গিয়ে জবানবন্দি নিয়ে নেবো।'

হেড কনেষ্ট বলে চলে গলো।

'কি ছোট শাহ মারা গেছেন?– আব্বাস হতভম্ব হয়ে বললো।

'এ ধরনের দাগী-পাপী এত তাড়াতাড়ি মরবে না। তুমিও মনে হয় ঐ গদির মুরিদ'– আমি বললাম।

'হ্যাঁ জনাব! উনার তো হাজার হাজার মুরিদ আছে'– আব্বাস বললো।

'যারিনা ওখানকার মুরিদ নয়– আমি যারিনার দিকে কৌতুক চোখে তাকিয়ে বললাম– ঠিক না যারিনা? পীর সাহেব যে তোমাকে ডেকেছিলো, তুমি তো আর যাওনি, না?'

মরা মানুষের মতো যারিনার মুখের বর্ণ সাদাটে হয়ে গেলো। চোখ দু'টো হয়ে গেলো প্রাণহীন। রূপের যে দীপ্তি এতক্ষণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো সেটা এখন ম্লানতর। ভয় হলো– আবার না বেহুশ হয়ে যায়।

'যারিনা!– আশ্বাসের সুরে বললাম– 'এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বা কে তোমাকে ফুসলিয়ে বা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো?–

যারিনার উত্তর শোনার আগে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম– কুড়াল হাতে ঐ মেয়েটি কে ছিলো, যে তোমাদরে বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো? না বললে মনে রেখো, এই মেয়ের গুম হওয়া নিয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কয়েকজন সাক্ষীর সামনে ওকে তোমাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তোমার বাবাকেও আইনত করণীয় হওয়া সত্ত্বেও পাকড়াও করিনি...........

'কারণ আমি জানি, যারিনার সঙ্গে তোমার প্রেম-প্রনয় আছে। তোমার কাছে বিয়ে বসার ইচ্ছে ছিলো যারিনার। কিন্তু তা আর হয়নি। যারিনা বিয়ের প্রথম রাতেই ওর স্বামীকে পরিস্কার বলে দিয়েছে, আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে মেনে নেবো না.....

তোমাকে আরেকবার বলছি, বিবাহিত এক মেয়েকে তুমি অপহরণ করেছো, সত্য কথা বলতে না চাইলে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও এই মুহূর্তেই। এই প্রেমের কারণে তোমাকে অনেক খেসারত দিতে হেব........

*** *** ***

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই যারিনা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো।

'সেটা আমি ছিলাম। কুড়াল আমার হাতেই ছিলো। আব্বাস আমাকে অপহরণ করেনি। আমি নিজেই গিয়েছি।'

'কোথায়! কার কাছে?......... আর গভীর রাতে ওর বাড়িতে কেন গেলে?........... আমার কথা শোন যারিনা! তোমাকে বা আব্বাসকে শাস্তি দেবোই এই ভেবে আতংকিত হয়ো না। তোমাদেরকে আমি বেকসুর বিদায় করতে পারবো। শুধু সত্য কথা বলো।

'জনাব! আব্বাস মিনতি করে বললো– আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করুন। ওকে আমিই অপহরণ করেছি। রাতে ও অন্য কোথাও থেকে আসেনি। এত দিন ও আমার কাছেই ছিলো। ওকে আমি বন্দি করে রেখেছিলাম।'

আমি রেগে গেলাম আবার হয়রানও হলাম যে, একি বাজে বকছে। দু'জন দুই কথা বলছে! আর তাদের প্রতি আমার সহমর্মিতার বিষয়টা উপলব্ধি করছে না।

'তোমরা তো জঙ্গলি আছই– আবি বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললাম– আমাকেও জঙ্গলি ভাবছো। তোমরা আসামী এবং থানায় বসে আছো। এই অনুভূতিটুকুও কি নেই! তুমি এটা কেন ভাবছো না, তোমার বোন দু'জনকেও থানায় ডেকে আনা হয়েছে। এটা একটা সম্মানিত পরিবারের জন্য কতটুকু অসম্মান।

তোমার বাপ বোন থেকেও আমি জবানবন্দি নেবো। যারিনার বাপ, মা ভাইও এখানে। তোমরা তো জানো না, থানাওয়ালাদের জিজ্ঞাসাবাদ কত কঠিন হয়ে থাকে। সবার বেইজ্জতি হবে।'

'আমি আব্বাস ও তার পরিবারের জন্য জান দিয়ে দেবো– মুহূর্তের মধ্যে সাহসের দীপ্ত ছড়িয়ে পড়লো যারিনার কণ্ঠে– আমি আপনাকে সবকিছু খুলে বলছি। আব্বাস আমাকে বাঁচাতে মিথ্যা কলা বলছে। আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। আপনি থানার অফিসার। আমার ব্যক্তিত্ববোধ আপনি আসলে বুঝবেন না।'

যে যারিনার ব্যপারে শুনছিলাম কথা বলতে জানে না তার মুখ এখন খৈ ফৌটায় ব্যস্ত হয়ে গেছে। একটু আগে যে মুখটি মরার মতো সাদাটে হয়ে গিয়েছিলো সেটি এখন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।

ওর সৌন্দর্যের ছটায় ঘর আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিস্পাপ সাফল্যের কমনীয়তা ফুটে উঠেছে। আমার মনে হলো, এই কান্তিবর্তী মেয়ের পক্ষে বড় ধরনের অপরাধ করা কঠিন কাজ। তাই ওকে অভয় দিয়ে বললাম, যা ঘটেছে এর কানকড়িও যেন বাদ না যায়।

'আমি যা করেছি আমার আল্লাহ্ দেখেছেন- যারিান বললো- আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতি আমার পরম ভরসা আছে। আপনার সামনে মিথ্যা বললে আল্লাহর সামনেও মিথ্যা বলতে পারবো।'

পুলিশের সোর্সরা অনেক ভয়ংকর ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকে। আর বড় বড় অপরাধীদের ব্যপার তো আছেই। ওদের কাহিনী শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং ভোলা যায় না তা সহজে। যারিনার ঘটনাও সেরকম। আজো সেই স্মৃতি তাজা। জানিনা যারিনা আমার ওপর কি প্রভাব ফেলে গেছে। ও যে জবানবন্দি দিয়েছে, এখানে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে।

যারিনা কথা শুরু করলো এখান থেকে যে, সে আব্বাসকে ভালোবাসতে। এছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতো না। চুপচাপ থাকা তার আজন্ম স্বভাব। কারো কোন কথা বা কাজ খারাপ লাগলে, দুঃখ পেলে নিজের বুকেই তা চেপে রাখতো। রাতে মাঝে মধ্যে তার স্লিপিং ওয়ার্ক তথা ঘুমের মধ্যে চলা ফেরার স্বভাব ছিলো।

বিশ পচিশ দিন পরপর এমন হতো। ঘরের সবাই সকাল হলে বলতো, গত রাতে সে ঘুমের মধ্যে সারা বাড়ি ও আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়িয়েছে।

ইকবালের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর সে তার মার কাছে অনুরোধ রেখেছে, কেঁদেছে যে, ইকবালের সঙ্গে যাতে তার বিয়ে না দেয়া হয়। আব্বাসের সঙ্গে যাতে দেয়া হয়। কিন্তু তার বাবা তার স্বপ্নকে গলা টিপে মেরেছে।

'আব্বাস আমার সামনেই তো বসা আছে- যারিনা বলে গেলো- 'আমি ওকে বলে রাখছি, কোন কিছু মিথ্যা হয়ে গেলে আমাকে বাধা দিয়ো.....

আমি এবং সে দু'জনে মিলে কুরআন শরীফের ওপর হাত রেখে কসম করি যে, আমরা বিয়ে করবো। ও বলেছিলো, আমি আর কোন মেয়েকে আমার জীবনে স্থান দেবো না। আমি কসম করেছিলাম, আমি কোন পুরষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবো না।'

তারপর তো ইকবালের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেলো, কিন্তু পবিত্র কুরআনের প্রতি যে তার তাযীমবোধ ছিলো, তার মধ্যে ভীষণভাবে সেটা অনুতপ্ততা জাগালো। ওর কসম ভেঙ্গে গেছে। তার অনিচ্ছায় হলেও এর শস্তি তো পেতেই হবে।

বাসর ঘরে তাকে বসানোর পর সে কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে ডেকেছে। দুআ করেছে–

'হে আল্লাহ! আপনার পবিত্র কালামের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার শক্তি দিন।'

বাসর ঘরে ইকবাল আসার পর তো সে তার স্বামীকে তার প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়ে দিলো।

যারিনা আমাকে বললো, সে তো এমন সাহসী ও মুখ চোটা ছিলো না যে, একজন সবল যুবককে এ ধরনের কথা বলতে পারবে। সে নিজেই হয়রান হয়ে গেলো ইকবালকে কি করে এমন কথা বলে ফেললো। তারপর তার তখন বিস্ময়ের সীমা রইলো না ইকবাল যখন পেছনে হটে গেলো।

যারিনা আশা করেছিলো, ইকবালের মতো এমন পুরুষ একজন নারীর প্রত্যাখ্যান সইতে পারবে না। তাকে চড় দেবে বা আঘাত করবে এবং জোর করে ওকে বশ মানাতে চেষ্টা করবে। কারণ, যারিনা আগেই জানেতা, ইকবাল অত্যান্ত সুপুরুষ নির্ভীক পুরুষ। এলাকায় ডাকাবুকা হিসাবে তার বেশ খ্যাতি আছে।

যারিনার মতো আমার বিস্ময়ও কম ছিলো না। আমিও তো একজন পুরুষ। ইকবাল যে আবেগ উদ্দমতা ও তীব্র কামনা নিয়ে বাসর ঘরে গিয়েছিলো, একজনপুরুষই সেটা অনুভব করতে পারে। এটা সবাই তো বুঝতে পারবে, ইকবাল ছিলো গ্রামের কয়েক ক্লাশ পড়ুয়া ছেলে। এরকম ছেলের বউ যখন যারিনার মতো এক সুন্দরী মেয়ে হবে তখন তার অবস্থা– ভাবাবেগ কেমন তীব্রতর হওয়ার কথা?

এক কথায় সে রাতে যে কোন যুবক আদিম পর্বে এসে চরম হিংস্র হয়ে যায়। অথচ ইকবাল যারিনার প্রত্যাখ্যানের জবাবে একেবারে নিভে গেলো। ওর আগুনে যৌবন বরফ হয়ে গেলো। ইকবাল বলেছিলো, যারিনা আমাকে তাবিজ করেছে।

*** *** ***

যারিনা ইকবালের মতোই হুবহু বর্ণনা দিলো ওদের বাসর রাতের। এই এক মাসের মধ্যে ইকবাল আর যারিনাকে তার স্ত্রী বানানোর সাহস করেনি। বরং

তিন চারবার যারিনাকে মিনতি করেছে। কিন্তু যারিনাকে গলাতে পারেনি। তবে ওর সঙ্গে কখনো বিরূপ আচরণ করেনি।

'তোমার ইচ্ছেটা কি ছিলো যারিনা?- আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম- তুমি যেভাবে চালাতে চেয়েছো কতদিন চলতো এমন? ইকবাল কত দিন এটা সহ্য করতো?'

'আমি চেয়েছিলাম ইকবাল অসহ্য হয়ে আমাকে তালাক দিয়ে দেবে- যারিনা বললো- 'তালাক না দিলে সে আমাকে মারপিট করতো। তখন আমি ওর নামে কাপুরুষের বদনাম ছড়াতাম যে, ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আর না হয় শেষ পর্যন্ত আমিই আত্মহত্যা করতাম'।

যারিনা এরপর শোনালো পীরের কথা। যত অপ্রতিভ আর অমেশুক হোক যারিনা, সে তো নির্বোধ নয়। পীর যখন ওর কাছে আসলো তখনই সে বুঝে ফেলে পীরকে ইকবাল এনেছে। পীর যে যারিনাকে বলেছে, তোমার চোখ ভয়ংকর ছায়া দেখা যাচ্ছে যারিনা এতে মোটেও ভয় পায়নি। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মুক্তির জন্য দুআ করতো।

যারিনার শ্বশুড় বাড়িতে পীর দ্বিতীয়বার যখন আসলো, যারিনাকে পৃথক এক কামরায় বসানো হলো। পীর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার তো তোমার স্বামীকে ভালো লাগে না।

যারিনা পীরের কাছে স্বীকার করলো, হ্যাঁ, ওকে তার ভালো লাগে না। পীর তাকে তাবিজ পান করিয়ে চলে গেলো এবং চৌকিদারের স্ত্রীকে দিয়ে যারিনাকে ডাকালো।

যারিনা পীরের বদ নিয়ত তখনই টের পেয়ে গেলো। পীরের যদি অলৌকিক কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে তো সে কবেই ইকবালের শুধু স্ত্রীই নয় দাসী বানিয়ে ফেলতো।

শ্বশুর বাড়িতে যারিনা একটা দুশ্চিন্তা আর ঘোরের মধ্যে ছিলো। আরেকটা চাপ ছিলো ইকবাল ওর বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। যারিনার কল্পনায় সবসময় আব্বাসই আসতো।

ঘুরে ফিরে আব্বাসের ছবিই বিচরণ করতো যারিনার মনের আঙ্গিনায়। ওখানে এবং নিজের বাড়িতেও ওর এমন কোন সখি বা বান্ধবী ছিলো না যার কাছে মনের কথা বলে হালকা হবে সে। কষ্ট আর হতাশার আগুন ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো।

এই আচ্ছন্নতার মধ্যেই সে একদিন স্বপ্নে দেখলো, অনেক দূরে আব্বাস দাঁড়িয়ে আছে। ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওদের মাঝখানে মেঠু সড়ক, নাড়া

মুড়ানো যমিন আর বৃক্ষ সাড়ি। ও আব্বাসের কাছে ছুটতে শুরু করলো। আচমকা কোথেকে দুই লোক ছুটে এসে ওকে ধরে টেনে হেচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। আর সে হাত পা ছুড়তে লাগলো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হচ্ছিলো না। এক লোক ওকে কাঁধে তুলে নিলো। আরেকজন ছুড়ি বের করে ওকে প্রাণনাশের হুমকি দিলো।

তারপর যারিনার চোখে আধার নেমে এলো। তারপর আলো আধরি এবং এর কিছুক্ষণ পর ওর চেতনার আলো ফিরে পেলো। ও দেখলো এক লোক তাকে কাঁধে তুলে রেখেছে আরেকজন ছুরি দেখাচ্ছে।

স্বপ্নের ঘোর কাটতেই ও বুঝতে পারলো স্লিপিং ওয়ার্ক হয়েছে তার। ঘুমের মধ্যেই সে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো। সুযোগ পেয়ে ওরা অপহরণ করেছে। সে চিৎকার চেচামেচি করতে লাগলো। কিন্তু ধূ ধূ ফসলি মাঠে আর কত দূর আওয়াজ পৌছবে।

ওকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাঁড় করানো হলো। ছুড়ি ওয়ালা ওর গলায় ছুরি ধরে হুমকি দিলো চিৎকার বন্ধ না করলে যবাই করা হবে। যারিনা চিৎকার করেই বললো, হ্যাঁ, আমাকে যবাই করে দাও।

'কোন প্রেমিকের কাছে যাচ্ছিলে। আমরা তোমাকে আর এগুতে দেবো না'– ওদের একজন বললো।

যারিনা কাঁদতে কাঁদতে জানালো, ওর ঘুমের মধ্যে চলাফেরার রোগ আছে, সে অমুকের মেয়ে অমুকের স্ত্রী।

একজন তখন বললো, ঠিক আছে, চলো। তোমাকে তোমাদের বাড়িতে রেখে আসি। একথা বিশ্বাস করে যারিনা একটু পিছিয়ে গিয়ে গায়ের উড়না ঠিক করতে গিয়ে সেটা একটু আলগা করলো। ওমনিই একজন উড়নাটি কেড়ে নিয়ে তার মুখের ভেতর গুঁজে দিলো। তারপর তাকে উঠিয়ে নিলো।

'ওদেরকে চিনতে পেরেছিলে?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, যারিনা বললো– এমনিই তো চাঁদ মেঘে ঢাকা ছিলো, তারপর আবার গুণ্ডা দু'জনের মাথা ও চেহারা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা ছিলো।

ওকে উল্টো করে কাধের ওপর নিয়ে যাচ্ছিলো। এজন্য কোন দিকে যাচ্ছে সেটা যারিনা বুঝতে পারছিলো না। ওরা তাকে এক বাড়িতে নিয়ে গেলো। তখন কারো গলার শব্দ তার কানে পৌছলো– 'শিকার শিকার'।

বাড়ির এক কামরায় নিয়ে ওকে খাটের ওপর প্রায় ছুড়ে ফেললো। সেখানে টিম টিম করে একটি চেরাগদান জ্বলছিলো। লোক দুটি বাইরে চলে গেলো। এবং বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলো। ভয়ে যারিনা বেহুশ হয়ে

গেলো। কতক্ষণ পর ওর জ্ঞান ফিরলো মনে নেই। চোখ খুলতেই দেখলো, সে অন্য আরেকটি খাটের ওপর বসা।

'তুমি বলেছিলো, আমার 'কারামত' দেখতে চাও– পীর হাসতে হাসতে বললো– দেখেছো আমার কারামত....... আমার জিনেরা তোমাকে কিভাবে উঠিয়ে এনেছে?'

'ঘুমের মধ্যে আমি জানি না কোথা চলে গিয়েছিলাম– যারিনা কাঁদতে কাঁদতে পীরের কাছে হাত জোড় করে বললো– 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন। আমার স্বামী আমাকে জানে মেরে ফেলবে।'

পীরের মনে দয়ার উদ্রেক হবে তো দূরের কথা, পীর যারিনার কথায় আরো মজা পেলো। হিংস্র জানোয়ারের মতো আচরণ করলো ওর সঙ্গে। যারিনার আর্তচিৎকার শোনার জন্য কেউ এলো না।

*** *** ***

পীর যারিনাকে লোভের চূড়ান্ত দেখিয়ে বললো, পীর তাকে এ এলাকার পীর সম্রাজ্ঞী বানাবে। ইকবালকে তালাক দিতে বাধ্য করাবে। তারপর তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু যারিনার আর্ত চিৎকার চলতেই থাকে।

দুই দিন পীর ওকে এভাবেই কয়েদ করে রাখে। শুধু একজন পরিচারিকা খাবার দিয়ে যেতো। কামরায় আর কেউ আসতো না।

এক রাতে আবার পীর হানা দিলো। যারিনা তার পায়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করলো। কিন্তু সে তখন হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণী হয়ে গেছে।

আরো দু' তিন রাত এভাবেই কেটে গেলো। এক রাতে কামরায় পীরের ছেলে এসে হাজির হলো। দূর দূরান্তের গ্রামের মেয়েরাও তাকে ভালো করে চেনে। যারিনাও তাকে দেখেছে আগে। তার লম্পটের গল্পও শুনেছে অনেক। তাকে দেখে যারিনা আরো ঘাবড়ে গেলো।

কিন্তু পীরের এই ঠুণ্ডা মার্কা ছেলে যারিনার সঙ্গে বড় নরম– আদুরে গলায় কথা বললো– 'আমি আজই জেনেছি, আমার বাপ তোমাকে ধরে এনে এখানে কয়েদ করে রেখেছে। তোমাকে যে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো সেই সুযোগও পাচ্ছিলাম না। আজ এখন সুযোগ পাওয়া গেছে।'

'এখন কোথায় পীর?'– যারিনা জিজ্ঞেস করলো।

'এখানেই আছে– পীরের ছেলে বললো– কিন্তু মদ খেয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে।'

‘ছোট শাহজী!– যারিনার গলা ভেঙ্গে পড়লো মিনতিতে– আমাকে আমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দাও। টাকায় তোমার দু’ হাত ভরে দেবো।

‘আমি কিছুই নেবো না তোমার কাছ থেকে– ছোট শাহজী বললো– চলো তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

ছোট শাহ্ যারিনাকে চোরের মতো পা টিপে টিপে হাবেলি থেকে বের করে আনলো। তার হাতে একটি কুড়াল ছিলো। প্রায় আধা মাইল যাওয়ার পর যারিনা দেখলো ওরা ওদের গ্রামের উল্টো দিকে যাচ্ছে। যারিনা প্রশ্ন তুললো, আমাদের গ্রাম তো ওদিকে। আপনি এদিকে যাচ্ছেন কেন?

ছোট শাহ্ বললো, ঘোর পথে যাচ্ছি। পথে আমার বাপের লোকজন থাকতে পারে।

অনেক দূর যাওয়ার পরও ছোট শাহ রাস্তা বদলি করলো না। যারিনা বললো, ছোট শাহজী! আমাদের গ্রাম তো দেখি অনেক দূর সরে গেছে।

‘তোমাকে আমি তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি না’– ছোট শাহ্ গাঢ় কণ্ঠে বললো– ‘তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে তুমি খুশী হয়ে যাবে। তোমাকে আমি বিয়ের আগে দেখিছি। তখনই ঠিক করি, তোমাকে আমার রানী বানাবো। আমি আমাদের গদির শক্তি প্রয়োগ করতেই তুমি স্বেচ্ছায় আমার হাতে ধরা দিয়েছো। এখন তুমি তোমার ঘরের কথা ভুলে যাও।’

যারিনা তার কাহিনী শোনাতে গিয়ে বললো,

আমি প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, নিজেকে নিজে খতম করে দেবো। কিন্তু যে কামরায় আমাকে রাখা হয়েছিলো সেখানে ধারালো কিছুই পেলাম না, যেটা দিয়ে বুক বা পেট চিড়ে আত্মহত্যা করতে পারবো। এরপর ছোট শাহ্ যখন তার আসল রূপের কথা জানালো তখন আমার ভেতর আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ রইলো না। আমি মৃত্যুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিলাম।

ছোট শাহকে শান্ত গলায় বললাম। ‘ঠিক আছে, আমি কোন বাঁধা দেবো না। আমি আপনার সঙ্গেই থাকবো। কিন্তু আপনি আমায় রাখবেন কোথায়? পীরজী আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না?’

ছোট শাহ তখন তার বাপকে কয়েকটি অকথ্য গালি দিয়ে বললো,

‘ওকে আমি সোজা করে ফেলবো। এখন তোমাকে অন্য একটি গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি। দুই তিন দিনপর তোমাকে এসে নিয়ে যাবো আমি’।

যারিনা আসলে ছোট শাহকে আশ্বস্ত করতে চাইলো, সে এখন তার অনুগত হয়ে গেছে। যারিনার কথায় দারুণ খুশি হলো ছোট শাহ। রতের গাঢ় নির্জনতার মধ্যে ছোট শাহ্ যারিনাকে নিয়ে হাটছে।

যারিনার কথায় ছোট শাহের ভেতর আবেগ উথালপাতাল করে উঠলো। যারিনাকে মুহূর্তের জন্য জড়িয়ে ধরলো। যারিনাও খুব আনন্দ পাচ্ছে এমন ভান করে ছোট শাহের হাত থেকে কুড়ালটি নিয়ে নিলো। কিছু দুর পর্যন্ত যারিনা প্রেম ভালোবাসার কিছু সংলাপ আওড়িয়ে প্রেমিকের অভিনয় করে গেলো।

এক সময় যারিনা হঠাৎ করে একটু পেছনে সরে এলো। তারপর আর দেরি করলো না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কুড়াল দিয়ে আঘাত হানলো ছোট শাহের ওপর। কোপটি পড়লো ছোট শাহের কাধের কাছে। ছোট শাহ আর্তনাদ করে পেছন দিকে ফিরতে ফিরতে যারিনা আরেকটি কোপ বসালো। এটা লাগলো একেবারে কাঁধের মাঝখানে।

ছোট শাহ এই দুই আঘাতে কাবু হওয়ার মতো লোক ছিলো না। সামান্য টলতে টলতে যারিনাকে ধরতে এগিয়ে এলো। এমন দুঃসাহসিক কাজ যারিনা করতে পারবে কখনো কল্পনাও করেনি।

এজন্য উত্তেজনায় কাপছিলো। যখন ছোট শাহকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো, খুব ভয় পেয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেলো কাঁপুনি। কুড়ালটিও যেন ধরে রাখতে পারছিলো না।

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে আরেকটি কুড়ালের আঘাত হানলো ছোট শাহের ওপর। কিন্তু কুড়ালের ব্লেডটি উল্টে গিয়েছিলো। তাই বাট তার মাথায় পড়লো হাতুড়ির বাড়ির মতো করে। মাথায় আঘাত পেয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না ছোট শাহ। বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো।

নিজ গ্রামের পথ যারিনার জানা ছিলো। সেদিকে ছুটতে শুরু করলো। ছোটার সুবিধার জন্য কুড়ালটি ফেলে দিলো। কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে কুড়ালটি উঠিয়ে নিলো। যাতে পথে কোন বদমায়েশ বা চোর ডাকাত ঝামেলা করলে তাকে শায়েস্তা করতে পারে।

যারিনা আমাকে বলেছিলো, মৃত্যুর সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। কিন্তু একজন মানুষ মেরে তার যে অবস্থা হলো সেটা সে বর্ণনা করতে পারছিলো না। বলার সময় তার শরীর কাঁপছিলো। ঠিকমতো শব্দও বের হচ্ছিলো না। সে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলো। কোথায় যাবে কার কাছে যাবে কিছুই ফয়সালা করতে পারছিলো না।

নিজের মা বাবার কাছে? ইকবালের কাছে? আব্বাসের কাছে?

নিজ গ্রামে পৌছার পরে ভয় তাকে আরো ভীষণভাবে চেপে ধরলো। সে অবস্থাতেই সে আব্বাসের ঘরে চলে গেলো।

*** *** ***

রক্তমাখা কুড়াল আর রক্তাক্ত কাপড়ে যারিনাকে দেখে আব্বাসের বাপ, মা বোনরা হতভম্ব হয়ে গেলো। যারিনার মুখ থেকেও কোন কথা বের হচ্ছিলো না। বড় কষ্টে সে যতটা সম্ভব ঘটনা শোনালো।

আব্বাসের বাবা –যারিনার বাবা ও ভাইকে ডেকে নিয়ে এলো। তাদেওর মাথা ঘুরে গেলো। কি করবে না করবে ভেবে পাচ্ছিলো না তারা।

ওরা একটা কাজ করলো। আব্বাসের এক বোনের কাপড় যারিনাকে পরিয়ে দিলো। আর রক্তাক্ত কাপড়টি লুকিয়ে ফেললো। কুড়ালটিরও রক্ত ধুয়ে লুকিয়ে রাখলো। দুশ্চিন্তায় দিশেহারার চরমে পৌঁছে গেলো তাদের অবস্থা। তখনই ওদেরকে দিয়ে পাকড়াও করি আমি।

'জনাব! যারিনার কথা শেষ হলে আব্বাস বললো– একটা 'মেহেরবাণী করুন। রিপোর্ট লিখে দিন, ছোট শাহকে আমি কুড়াল দিয়ে মেরেছি। আমার নামে এ অপরাধ লিখুন যারিনাকে ছেড়ে দিন।'

সত্যি বলতে কি, আমিও চক্করেড় পরে গেলাম। ঐ পীর ও তার ছোট শাহের ওপর তো আমার আগ থেকেই ঘৃণা ছিলো। এ ঘৃণা ক্রোধে রূপান্তরিন হলো। পীরের ছেলে ছোট শাহ মরেছে না জীবিত আছে এ খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি ভেতর ভেতর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। যারিনাকে বাঁচাবো। আর পীরকে নারী অপহরণের দায়ে গ্রেফতার করবো।

যারিনা ও আব্বাসকে অন্য কামরায় বসিয়ে ওদের দু'জনের বাপকে ডেকে বললাম,

আপনারা মেয়েদের সবাইকে নিয়ে বাড়ি চলে যান। আর যারিনার রক্তমাখা পোষাকাদি আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে ফেলুন। আর কুড়ালের বাটটি ভেঙ্গে জালিয়ে দিন। স্টিলের ব্লেডটি পরিত্যক্ত কোথাও পুতে ফেলুন বা কোন কূপের ভেতর ফেলে দিন। তবে কেউ যাতে আপনাদের এ সব কাজ না দেখে বা ঘুনাক্ষরেও জানতে না পারে।

হাসপাতাল থেকে খবর এলো, ছোট শাহ্ কথা বলার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। আই.এস.আই.-এর আসারও সময় হয়েছে।

আমি হাসপাতালে চলে গেলাম। ছোট শাহ-এর জ্ঞান পুরোপুরি ফিরেছে। তার সামনে পীর বসে আছে। পীরকে বললাম, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। পীর যেতে রাজী নয়, চোখ গরম করে তাকালাম। কাজ হলো। বাইরে চলে গেলো।

'কী খবর ছোট সরকার! পীরের ছেলেকে বললাম– এমন দুঃসাহস কোন হতভাগার! খালি নামটা বলো, ওকে দশ বছরের জেল দেবো!'

'জানি না জনাব! সে বললো, 'ওরা ছিল তিনজন। দু'জন আমার ওপর কুড়াল চালালো। আমি বেহুশ হয়ে গেলাম। আপনি আমার পকেট দেখুন। কিছু পয়সা ছিলো। তাও গায়েব।'

বেটা বলছে কি? এমন মোটা দাগের ধোকা দিচ্ছে আমাকে? নাকি মাথায় চোট খাওয়াতে মাথায় গণ্ডগোল হচ্ছে!

'কি বলছো ছোট শাহ! হুশ কি পুরো পুরি ফিরছে তোমার?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ পুরোপুরি জ্ঞান ফিরেছে। এই যে আপনি থানাদার আর ইনি ডাক্তার সাহেব!'

আমি ও ডাক্তার সাহেব এবার তার সঙ্গে গল্পের ভঙ্গিতে হালকা সুরে কথা বলে দেখলাম। না, সত্যিই পুরাপুরি জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু ছোট শাহ একই কথা বলতে লাগলো। তিন হামলাকারী মিলে তাকে কুড়াল দিয়ে মেরেছে।

'এর মধ্যে কোন মেয়ে ছিলো না তো?'– আমি তার চোখে চোখ রেখে এক টুকরো বাঁকা হাসি উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'না জনাব! কোন মেয়ে ছিলো না, এটা মেয়েদের ব্যপার নয়'– বলার সময় তার গলা ঈষৎ কেঁপে গেলো। মুখের ওপর দিয়ে শংকার ছায়া ঘুরে গেলো।

ডাক্তার সাহেব অন্য রোগীর কাছে চলে গিয়েছিলেন। তবুও আমি ছোট শাহের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম,

'আমি জানি এটা কিসের চক্কর ছিলো। তুমি যদি চাও, তাহলে তুমি যা বলবে রিপোর্টে আমি তাই লিখবো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ পীরের ছেলে খুশি হয়ে উঠলো– হ্যাঁ তাই লিখুন। আমি আমার বেইযযতী চাই না।

সে যা বলতে চায় আমি বুঝে ফেললাম। সে চায় তার বাপ যাতে টের না পায় যে, শিকারকে ছেলে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আর শিকারও শিকার হয়ে গেছে।

'আপনি কারো বিরুদ্ধে রিপোর্ট বা মামলা লিখবেন না। আমিও কোর্টে মামলা উঠাতে চাই না– পীর পুত্র বললো।

পীরের সঙ্গে ছেলের ব্যপার নিয়ে কথা বলা জরুরী। পীরকে ভেতরে ডেকে জানালাম, তার ছেলে কি বলছে।

ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো পীর। ছেলে বাপের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বড় অকথ্য ভাষায় জবাব দিলো। অপমানে পীরের চেহারা লাল হয়ে উঠলেও পীর কিছু বললো না। ছেলের কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার পেয়ে পীর অভ্যস্থ।

পীর তো এই ধারনায় খোশ মেজাযে ছিলে যে, আমি আসল ঘটনা জানি না। পীর হয়তো নিশ্চিতভাবেই জানতো, যারিনাকে তার ছেলেই দখল করেছে। আগ থেকেই পিতা পুত্রের মধ্যে খিটমিট লেগেছিলো।

এ ঘটনার পর তো সেটা ভীষণ শত্রুতার রূপ নিবেই। পীর হাসপাতালেও এসেছে এ কারণে যে, যাতে লোকে বলতে না পারে মরণাপন্ন ছেলেকে দেখতে বাপ এলো না।

'আচ্ছা পীরজী! আমি পীরের কাছে জানতে চাইলাম– আপনি কি আপনার ছেলের ওপর হামলার ব্যাপারে মামলা দায়ের করবেন?'

'আমি কি জানি ও যখম হয়েছে কোথায়?– পীর বললো তাচ্ছিল্য করে– 'আমার পক্ষ থেকে রিপোর্ট করার মতো কিছু নেই'।

*** *** ***

পীর ও তার ছেলে মামলা না করাতে আমি খুশিই হলাম। যারিনা বেঁচে গেলো। কিন্তু এখন বিষয় হলো, যারিনাকে না জড়ালে পীরকেও তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া যায় না। কিন্তু যারিনাকেও জড়ানো যাবে না। পীরকে শাস্তি দিতে হবে। কমপক্ষে মানসিকভাবে পীরকে পঙ্গু করে দিতে হবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিলো, প্রথমে যে দু'জন যারিনাকে তুলে নিয়েছিলো এবং পীরের হাবেলিতে পৌছে দিয়েছিলো তাদেরকে তো যারিনা সনাক্ত করতে পারবে না। আর এটাও প্রমাণ করা যাবে না পীর যারিনাকে বন্দি করে অমানুষিক অত্যাচার করেছে। যারিনাকে তো পাওয়া গেছে অন্য জায়গা থেকে।

পীরকে আমি পৃথকভাবে ডাকলাম।

'আমার কথা মন দিয়ে শুনুন পীর সাহেব!– পীরের প্রতি আমার তীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললাম– এসব ঘটনা কি করে ঘটলো তা আমি জানি। আপনার ছেলে আপনার শিকার মারতে গিয়ে নিজেই পটকা খেলো। আপনাকে এজন্য গ্রেপ্তার করে শাস্তিও দিতে পারি।'

'আপনি এলাকায় নতুন এসেছেন'– পীর দাপট দেখাতে চাইলেও তার সুরে স্পষ্ট অনিশ্চয়তা ছিলো– 'আমার ওপর হাত উঠানোর মতো ভুল করবেন না।

আপনি যদি আমার লোকজনকে ধরে তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিতে চান তাহলে আসলে আপনি লজ্জিত হবেন। বাইরে যে সাক্ষ্য তারা আপনার সামনে দেবে আদালতে গিয়ে সেটা অস্বীকার করে বসবে।'

'তুমি যা কিছু হওনা কেন আমার সেটা জানা আছে'– আমি আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলাম–

'তোমার মতো বদমায়েশরা ভালো মানুষের মুখোশ পরে একের পর এক অপরাধ করেই চলে। আরো বড় কোন অপরাধের অপেক্ষায় রইলাম আমি। যা দিয়ে তোমাকে যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। তখনই তোমাকে ধরবো এবং তোমার আস্তানা উপড়ে ফেলবো। তোমার ভালোর জন্য বলছি, বদমায়েশি কর্মকাণ্ড তোমার বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরে থাকতে দাও। তুমি যদি যারিনার বিরুদ্ধে বা তার মা বাবাকে উত্যক্ত করো বা কোন ছুতোয় চড়াও হও; দেখবে, তোমার পীরগিরি উলঙ্গ করে ছাড়বো......

'এটা মনে করো না, তোমাকে আমি গ্রেপ্তারি বা শাস্তির হুমকি দিচ্ছি। তোমার ছেলের হাতে তোমাকে খতম করবো। মুরিদরা তোমার লাশ তখন পাবে, যখন তোমার নাপাক দেহ অর্ধেক কুকুর খেয়ে শেষ করে ফেলবে।'

পীরের মুখ দেখে মনে হলো, কে যেন তাকে আচ্ছামতো জুতো পেটা করে আলকাতরা মেখে দিয়েছে। আমি আসলে যারিনাকে নিরাপদ রাখতে চাচ্ছিলাম। তাকে এটা জানালাম না যে তার ছেলেকে যারিনা মেরেছে।

যা হোক, পীর শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলো। আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলো। আগের থানাদারকে যে মাসোহারা দিতে আমি যদি এর চেয়ে বেশি নিতে চাই তাও দিতে প্রস্তুত সে।

ঘুষের কথা বলায় তাকে আমি আরো কিছুক্ষণ শাসিয়ে সাবধান করে দিলাম যে, ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের নোংরা প্রস্তাব নিয়ে না আসে।

পীরের ছেলেকে নিয়ে আমার বড় সমস্যা ছিলো। এখনো সে সুস্থ হয়নি। দুই তিন দিন পর তার সঙ্গে কথা বলবো বলে ঠিক করলাম। থানায় ফিরে এসে আব্বাস ও যারিনাকে জরুরী কিছু কথা বলে ওদেরকে চলে যেতে বললাম। দু'জনে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমার মুখের কথা তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না।

'আমাদেরকে কি থানায় আসতে হবে আবার?'– যারিনা জিজ্ঞেস করলো।

'না, আমি তোমাদেরকে বোঝালামটা কি? আর ডাকবো না তোমাদেরকে....

এখন তুমি নিজেই তোমার সিদ্ধান্ত নাও। স্বামীর বাড়িতে যাবে না বাবার বাড়িতে যাবে। এটা একান্তই তোমার ব্যাপার।'

দু'জন চলে গেলো।

এর দিন তিন পর আমি হাসপাতালে গেলাম। পীরপুত্র সুস্থ হয়ে উঠেছে। পীরকে যেসব কথা বলেছিলাম তাকেও সে কথা বললাম। এটাও বললাম যে, তোমার তো লজ্জা থাকা উচিত, এক মেয়ের হাতে এভাবে মার খেয়েছো তুমি।

'আমি এর প্রতিশোধ নেবো'– সে গোয়ারের মতা বললো।

'সাবধান'! কণ্ঠ হিংস্র করে বললাম– 'যারিনা যদি আবার অপহৃত হয় বা তার কোন ক্ষতি হয় কিংবা উড়ো কোন হুমকি দেয়া হয় সোজা তোমাকে গারদে পুড়াবো। তারপর এমন মার মারবো যে, হাত থেকে গোশতগুলো খুলে খুলে আনবো। মোট কথা তুমি বা তোমার কোন লোক ওদের এলাকায় দেখা গেলে তোমার চামড়াই প্রথমে আমি তুলবো। আমি আমার কথা কখনো মাটিতে ফেলি না। মনে রেখো, আমার এলাকার সব গুণ্ডা বদমাশ আমার হাতে রয়েছে।

পীর ও পীরের ছেলের অপরাধ জগত এরপর অনেক ছোট হয়ে যায়।

এর আট দশ দিন পর কেউ একজন আমাকে জানালো, ইকবাল যারিনাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। তবে যারিনা তার আচরণের জন্য ইকবালের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। আরো মাস পাঁচেক পর আব্বাসের সঙ্গে যারিনার বিয়ে হয়ে যায়। স্পর্শকাতর একটি খুনের মামলার কারণে বিয়ের নিমন্ত্রণে আমি যেতে পারিনি।

প্রেম-পাপী পীর

চারদিকে আতংক, অস্থিরতা, অসহায়ত্ব। বাবা, ভাই আপনজন হারানোর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে প্রায় ঘরেই মাতম আর বিষাদ মাখা পরিবেশ।

এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। বিশেষ করে যেসব এলাকা বা প্রদেশের অধিকাংশ জোয়ানরা ফৌজে চাকুরি করতো সেখানে তো এই অসহ্য চিত্র ছিলো প্রতিদিনের মামুলি ঘটনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের পক্ষে উপমহাদেশের মধ্যে পাঞ্জাব ও সীমান্তবর্তী এলাকার লোকেরা বেশির ভাগ ফৌজে ভর্তি হয়েছিলো। এজন্য ইংরেজরাও এসব এলাকাকে পছন্দও করতো বিশেষভাবে।

এই অশান্ত অনিশ্চিত সময়ের মধ্যেও এমন কিছু লোক মাথা চারা দেয়, যারা হাসতে হাসতে মানুষের আতংকিত মন ও অসহায় অবস্থাকে পুঁজি করে ব্যবসা ফেঁদে বসে। ফৌজি এলাকাতেই এ ধরনের লোকদের আনাগোনা বেশি ছিলো। সহজ শিকার ধরার জন্য তাদের কাছেও এই এলাকাগুলো বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে দারুণ পছন্দের ছিলো।

গ্রামাঞ্চলের এক থানার ইনচার্জে ছিলাম আমি। একেও ফৌজি এলাকা বলতো।

একদিন এক গ্রাম্য এলাকা থেকে পাঁচজন লোকএলো থানায়। এর মধ্যে একজনকে বেশ অভিজাত মনে হলো। মধ্যবয়সী হবে। পাঁচ চল্লিশ কি সাতচল্লিশ হবে বয়স। সে লোক নিজেকে আর্মির ক্যাপ্টেন বলে পরিচয় দিলো।

পনের দিনের ছুটিতে এসেছে। পচিয়টা এমন উঁচু গলায় দিলো যেমন ফৌজির অফিসার তার অধীনস্তদের হুকুম দিয়ে থাকে।

সেনাবাহিনী সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল ব্যক্তিরা জানেন, আর্মির ক্যাপ্টেন সাধারণত অল্প বয়স্ক হয়ে থাকে। কিন্তু এ লোক এই বয়সেও ক্যাপ্টেন!

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেল সময় সৈন্য সংখ্যা কয়েকগুন বেড়ে যাওয়াতে সেনা অফিসারের সংখ্যা কমে যায়। তখন শিক্ষিত অনেক সুবেদার ক্যাপ্টেনের পদাধিকার লাভ করে। সন্দেহ নেই এ লোকও সুবেদারি থেকে ক্যাপ্টেনের পদ পেয়েছে।

ক্যাপ্টেন আমাকে জানালেন, এবার ছুটিতে আসার পর তাকে জানানো হলো, তার ছোট ভাইয়ের কাছে এক পীর সাহেব আসে। পীর সাহেব দাবী করে,

তাদের ঘরে নাকি প্রাচীন এক ধণভাণ্ডার মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। এটা বের করতে হলে পীরকে তিন রাত এখানে রাত জাগতে হবে।

ঘরের সবাই তো খুব খুশি। কয়েক রাত কাটালো সে পীর। এক রাতে একটি ঘরের মেঝে খুড়তে শুরু করলো। একবার কোদাল দিয়ে কোপ বসাতেই কোন ধাতব পদার্থের ওপর কোপ পড়লো। জিনিসটাকে চকচকে মনে হলো। পীর বাড়ির সবাইকে বললো, এখন আর সামনে খনন করা যাবে না। দুদিন পর আবার শুরু করতে হবে।

এই বাড়ির মানুষ আর কোন দিন এত খুশি হয়নি। রাতের বেলা পীর সেই ঘর থেকে সবাইকে বের দিয়ে আবার সাধনায় বসলো। পরদিন সকালে বাড়ির লোকেরা দেখলো, পীর গায়েব।

ক্যাপ্টেনের ভাই বললো, পীর সাহেব ধণভাণ্ডার আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। দু'দিনপর ধণভাণ্ডার নিজেই বেরিয়ে আসবে।

দু'দিন চলে যাওয়ার পর ছোট ভাই পীরের খোদাই করা গর্ত কোদাল দিয়ে আরেকটু খুঁড়তেই একটি থালা বের হলো। এর নিচে কিছুই নেই। গর্ত থেকে আরো অনেকখানি মাটি তোলা হলো। কিন্তু মাটি ছাড়া আর কিছুই আবিস্কার করতে পারলো না তারা।

ক্যাপ্টেরেন ছোট ভাই থালাটি ভালো করে দেখে আরেকটি ধাক্কা খেলো। আরে এই থালাটি তো ঐ পীরেরই ছিলো। ক্যাপ্টেন জানালো, ঐ পীর তার ভাইয়ের কাছ থেকে এক রাতে পাঁচশত টাকা (তদানিন্তন পাঁচশ টাকা বর্তমানে অনেক টাকা) নিয়েছে।

যতদিন সেখানে ছিলো বাড়ির লোকদের কাছ থেকে নানান ছুতো দিয়ে আরো অনেক পয়সা নিয়েছে। গ্রামের আরো দুটি বাড়ি থেকেও এভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

'যে দিন আমি গ্রামের বাড়ি পৌছি'– ক্যাপ্টেন বললো– 'আমার ভাই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমাকে এ ঘটনা জানিয়েছে। পরদিন অন্য গ্রামের এক লোক আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য বাড়ির দাওয়ায় এসে বসলো। কথায় কথায় লোকটি বললো, তাদের গ্রামে এক পীর এসেছে। কারামত ওয়ালা এক ওয়ালিআল্লাহ্ তিনি। গায়েবের খবরও দেন তিনি..... লোকটি পীরের কিছু কারামত শুনিয়ে গেলো......

পীরের আকার আকৃতি কেমন জিজ্ঞেস করলাম তাকে। সে ঐ পীরের বর্ণনাই দিলো। এখন সে ঐ লোকের গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে গেছে। আমাদের ঘোড়া আছে কয়েকটি।

আমার ভাইসহ আমাদের গ্রামের তিনজন লোক নিয়ে আমরা ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। যে গ্রামের কথা বলা হয়েছিলো সে গ্রামে পীরকে পাওয়া গেলো না। পীর আরো অনেক দূরের গ্রামে চলে গেছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হলো আমাদের।

পরদিন সকালে আমরা যে গ্রামে পৌঁছলাম, জানা গেলো পীর সাহেব এখানেই আছেন। গ্রামের একটি খোলা জায়গায় নতুন একটি কূপ খনন করা হয়েছে। কিন্তু পানি বের হচ্ছে না........

কূপের কাছে গিয়ে দেখলাম, সেখানে বহু লোকের জমায়েত। পীর সাহেব কোথায় জিজ্ঞেস করতেই কয়েকজন চোখমুখ গম্ভীর করে শোনালো, আরে মিয়া! পীরকে তো খোদা আসমান থেকে পাঠিয়েছেন। ষোল গজ খননের পরও কূপে পানির দেখা নেই। অথচ এ এলাকার দশ বার গজ খোদলেই পানির 'ঢের' উঠতে থাকে। যমিনের এই আজব অংশের মাটি কেন এমন হয়ে গেলো......

পীর পৌঁছে গেলো। গ্রামবাসীরা দৌড়ে দিয়ে আরজ করলো, ইয়া সরকার কূঁয়া যে পানি দিচ্ছে না। পীর কূপের সামনে গিয়ে একবার নিচের দিকে তাকালো, তারপর আকাশের দিকে। তারপর বলতে লাগলো, কূপের মধ্যে তাকে নামিয়ে দেয়া হোক।

কূপের মধ্যে পীরকে নামানো হলো। নিচে গিয়ে ওপর দিকে মুখ করে বললো, সবাই কূপ থেকে গুনে গুনে সাত কদম দূরে সরে যাও। লোকজন দূরে সরে গেলো।

দশ পনের মিনিট পর পীরের আওয়াজ শোনা গেলো। এসো লোকেরা! দেখে যাও! লোকেরা এগিয়ে গেলো কূপের দিকে।

*** *** ***

কূপ থেকে পানি বের হচ্ছে এই বলে যখন পীর কূপের নিচ থেকে আওয়াজ দিলো এই ক্যাপ্টেন তখনই সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। কূপ খননের সময় প্রথম যখন সামান্য পানি দেখা দেয় লোকেরা তখন ওপর থেকে 'মোবরক' 'মোবারক' বলে নিচে পয়সা ফেলে। তখন খননকারীরা তাদের বাকী খনন কাজ শেষ করে।

এখানেও লোকেরা পীরের আওয়াজ পেয়ে কূপের কাছে দৌড়ে গেলো। ওপর থেকে দেখলো, বিস্ময় আর আনন্দে সবাই শ্লোগান দিতে শুরু করলো।

ক্যাপ্টেনও একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ম চোখে তাকালো। সামান্য একটু জায়গায় পানি চকচক করছে। যাদের কূপ তারা এবং অন্যরাও নিচে পয়সা ছুড়ে দিতে লাগলো।

এখানে ক্যাপ্টেনের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কূপ সম্পর্কে লোকদের কাছ থেকে আগেই জেনে নিয়েছিলো। কূপের মালিকদেরকে বললো, পীরকে বাইরে বের করে আনো।

'পীরকে ওপরে টেনে তোলা হলো'– ক্যাপ্টেন বলে গেলো– 'আমার ভাই ও সঙ্গে আসা গ্রামের লোকেরা তাকে চিনে ফেললো।

লোকদেরকে বললাম, এই লোককে এদিক ওদিক যেতে দিবে না। আমার লোকেরা তাকে ঘিরে রাখলো। এসব মূর্খরা পীরকে নবীদের মতো মানে। লোকেরা তাই আমার বিরুদ্ধে হৈচৈ শুরু করলো। তর্ক করে সময় নষ্ট করলাম না। শুধু বললাম, মেহেরবানী করে আমাকে কূপে নামিয়ে দিন। তারপর যা ইচ্ছা বলবেন আমাকে......

'লোকেরা আমাকে রশি ও বালতিস সাহায্যে কূপের মধ্যে নামিয়ে দিলো। ষোলগজ গর্ত কম নয় কিন্তু। ধীরে ধীরে নামতে সময় লাগলো। নিচে নামতেই প্রস্রাবের কূটগন্ধ লাগলো নাকে।'

ওপর থেকে যেটা পানি বলে ভ্রম হয়েছিলো। নিচে এসে দেখি সেটা প্রস্রাব। দূর্গন্ধে আমার নাড়িভূড়ি উল্টে আসার যোগাড় হলো। শক্ত বেলে মাটি হওয়াতে প্রস্রাবও মাটি চুষে নিচ্ছিলো না'........

'কূপের এক মালিককেও বলে কয়ে ওপর থেকে নামালাম। নিচে নেমেই সে চোখ মুখ ফুচকে বললো, গন্ধ কিসের এখানে?

আমি তাকে বললাম, তোমাদের পীর যে পানি বের করেছে সে পানি শুকে দেখো।

লোকটি হাটু মুড়ে বসে পানির ওপর পুরোপুরি শুকতেও পারলো না। এক ঝটকায় পেছনে ফিরে এলো। তাকে বললাম, এখানে কোদাল চালাও। সে কোদাল চালালো। নিচ থেকে শুকনো মাটি ছাড়া আর কিছুই বের হলো না।

মালিক বুঝতে পারলো, আকাশ থেকে নেমে আসা তাদের পীর সাহেব প্রস্রাবের চমক দেখিয়ে অনেক পয়সা হাতিয়ে নিয়েছে......

'ওপরে এসে দেখলাম, পীর সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে, তার সাথে এই বেয়াদবির পরিনাম খুব খারাপ হবে। গ্রামের ওপর গজব পড়বে। পীরকে বালতির রশি দিয়ে বেঁধে কূপের ভেতরের দিকে ঝুলিয়ে দিলাম। পীর বদদুআ দিয়ে চললো। লোকেরা যখন তার এই ধোকাবাজি সম্পর্কে জানতে পারলো, তারা পীরকে ঢিল ছুড়তে লাগলো....

'এবার পীর বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করে দিলো। আমি লোকদেরকে ঢিল ছুড়তে বারণ করলাম। আর পীরকে বাধনমুক্ত করে জিজ্ঞেস করলাম সে কে?

সে হাতজোড় করে বললো, আমার কাছ থেকে সব পয়সা নিয়ে নাও আর আমাকে ছেড়ে দাও।

আমার ভাইতো ওকে জানে মেরে ফেলতে চাইলো। আমি তাকে থামিয়ে বললাম, একে পুলিশের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। একজন জানালো, পীরের সঙ্গে আরো দু'জন লোক ছিলো। ওদেরকে খোঁজা হলো, কিন্তু ততক্ষণে ওরা কেটে পড়েছে......

'সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো। তাই রাত করে থানায় যাওয়াটা কষ্টকর। এজন্য আমাদের গ্রামে নিয় এলাম পীরকে। যে ঘরে সে ধনভাণ্ডার আছে বলে গায়েবী খবর দিয়েছিলো সে ঘরেই তাকে বন্দি করে রাখা হলো। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিলো।

কিন্তু সকালে উঠে গিয়ে দেখা গেলো, পীর গায়েব! ঐ ঘরের আরেকটি দরজা ছিলো, সেটা বন্ধ করার কথা কারো মনে ছিলো না। দরজা ভেতরের দিকে, এটা দিয়ে লাগানো অন্যান্য কামরাতেও যাওয়া যায়। কামরায় শিকবিহীন একটি জানালা আছে। ঐ ভণ্ড ঐখান দিয়েই পালিয়েছে ....

পীরের বর্ণনা দেয়া হলো। ছয় ফুট দীর্ঘ। বয়স ত্রিশ বত্রিশ। রং বাদামী এবং কিছুটা গৌর। স্বাস্থ খুব চমৎকার। চেহারা গোলাকার। যে কারো কাছে ভালো লাগবে। চোখের দৃষ্টি গাঢ়। প্রভাব বিস্তারের মতো কিছু একটা আছে তার দৃষ্টিতে, ঘন কালো দাড়ি, সুন্দর করে ছাটা। মাথার কুচকুচে কালো চুল কাঁঠ অবদি নেমে এসেছে। তার ওপর পাগড়ি বাঁধা উঁচু করে। গাঢ় সবুজ রঙ্গের আলখেল্লা।

ধোকাবাজ পীর যাকে এখন আমি আসামী বলবো। তাকে সনাক্ত করার সবচেয়ে বড় আলামত আমাকে জানা হলো যে, তার বাম চোখটি নষ্ট। সে চোখের ওপর সাদা কাপড়ের লম্বা চৌড়া পট্রি বাঁধা।

তথ্যটা আমাকে আশান্বিত করে তুললো। কারণ, আসামীর জন্য এটা এমন এক আলামত যেটা সে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তার সঙ্গে যে দু'জন লোক ছিলো তাদের দাড়ি ছিলো বেশ লম্বা। তবে একজন মধ্যবয়সী আর একজন যুবক।

*** *** ***

অন্য কেউ হলে আমি এ কেস নিতাম না। বলতাম তোমরা জেনে শুনে বেওকুফী করবে আর ভণ্ডদেরকে নাচানাচি করে সর্বস্ব হারাবে আর থানায় এসে আমাদেরকে উটকো ঝামেলায় জড়াবে।

কিন্তু বাদী বা বিচারপ্রার্থী ছিলো এক ফৌজি ক্যাপ্টেন। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা পুলিশরা ফৌজকে অনেক ভয় পেতাম। আসল ব্যাপার হলো, তখন চলছিলো বিশ্বযুদ্ধ। এজন্য ইংরেজ শাসক সেনাবাহিনীর লোকদের বেশ খাতির যত্ন করতো।

এমনকি সমস্ত পুলিশ বিভাগে লিখিত এই আদেশনামা জারী করা হয় যে, তোমাদের কাছে কোন সেনা যদি কোন অভিযোগ নিয়ে আসে তাহলে তার অভিযোগ দূর করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। প্রতিটি জেলার ডিপুটি পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে সবাই এ হুকুম দিয়ে যায়।

এই এক কারণে এই মামলা আমি গ্রহণ করি। আরেকটা কারণ হলো, আমার এলাকায় প্রতারণার এই ঘটনা ঘটার অর্থ হলো, এ এলাকার অপরাধ জগতের লোকেরা অবাধে অপরাধ করে চলেছে। এখনি এর লাগাম টেনে না ধরলে বড় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে সময় লাগবে না।

তাছাড়া আসামী কোন এলাকার তাও জানা নেই। জানা থাকলেও ছদ্মবেশী আসামী শনাক্ত করে তাকে ধরা খুবই মুশকিলের কাজ। অবশ্য আসামী অন্য এলাকার হলে আমার এলাকার পেশাদার আসামীদের সহযোগিতা নিতে হবে আমাকে।

অপরাধীদের মধ্যে একটা নীতি আছে। সেটা হলো, প্রত্যেক অপরাধী নির্ধারিত এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে অপরাধ কর্ম করে না।

আমি ক্যাপ্টেনের রিপোর্ট অনুযায়ি এফ.আই.আর. লিখালাম। তারপর কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে তাদের গ্রামে চলে গেলাম। থানা থেকে চার মাইলেরও অধিক দূরত্বে তাদের গ্রাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন যারা ফৌজে চাকুরি পছন্দ করতো না তাদের ঘর থেকেও জোয়ানরা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে লাগলো। এমন কোন বাড়ি ছিলো না যেখান থেকে একাধিক জোয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়নি। এমন ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দুনিয়াতে আর কয়টা হয়েছে।

গ্রাম্য এলাকার এসব জেয়ানরা কোন না কোন ফ্রন্টে লড়াইয়ে শামিল ছিলো। তাই আহত নিহত হওয়ার খবর প্রতিদিনই আসতে লাগলো। প্রতিদিনই কোন না কোন বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তারা এসে জানাতো, তোমাদের ছেলে বা ভাই যুদ্ধবন্দি হয়েছে বা মারা গেছে। শোক, আতংক আর হতাশার গাঢ় এক কুয়াশার চাদর এসব ফৌজি এলাকাকে ঘিরে রেখেছিলো।

ফৌজের মা বাবা, ভাই বোন, স্ত্রী, শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন সবার শেষ ভরসা তখন নতুন নতুন গজে উঠা পীর, মুরশিদ। তাবিজ আর ঝাড় ফুক করে পীরেরা তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিতো।

কোন বাড়ির কেউ ফৌজ থেকে ছুটি নিয়ে এলে বা ভালোমন্দ কোন সংবাদ এলে পীরের কাছে কাড়ি কাড়ি নযরানা চলে যেতো।

অনেক পীর নিজেদের কিছু লোক বিভিন্ন গ্রামে চর নিয়োগ করে রাখতো। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুর বিভিন্ন বাড়ির ভেতর বাইরের সংবাদ জেনে আসতো। কোন বাড়ির কতজন জোয়ান কোন ফ্রন্টে আছে এটা জেনে নিতে পারলেই পীরদের কেল্লা ফতে।

তারপর তারা যে কোন এক গ্রামে গিয়ে ডেরা ফেলতো। কোন উদ্দেশ্যে কেউ এলেই তাদের বলার আগেই পীর বলে দিতো যে, তোমার ছেলে বা ভাই বার্মা ফ্রন্টে বড় বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। তারপর তাদের করণীয় সম্পর্কে উপদেশ দিতো এবং কিছু তাবিজ কবজও ধরিয়ে দিতো। কয়েক মুহূর্তেই পীরের পকেট ভরে যেতো কাঁচা পয়সায়। আর পেট পুড়ে উদর পুর্তির পর্ব তো আছেই।

*** *** ***

ক্যাপ্টেনের বাড়িটি বিশাল। তাদের বিস্তর জায়গা জমি আছে। এদের পূর্বপুরুষরাও সরকারি ফৌজের সদস্য ছিলো। ইংরেজ সরকার তাদেরকে নদী এলাকায় আবাদযোগ্য বিস্তৃত এলাকা দান করে। পুরো বাড়িটাই বিভিন্ন আয়তনের দালান কোঠায় বিন্যস্ত।

ভণ্ডপীর যে ঘরে ধনভাণ্ডার আছে বলে ধোকা দিয়েছিলো সে ঘরে গেলাম আমি। ঘরের এক দিকে একটি গর্ত দেখা গেলো, গর্তটি দুই ফুট এবং ততটুকুই গভীর। এর পাশে একটি কোদাল ও একটি থলে পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে অব্যবহৃত একটি খাট, পুরনো সুটকেস ও কিছু আসবাবপত্র দেয়াল ঘেষে রাখা আছে।

পাশের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দরজাটি খুলে আমি পাশের ঘরে গেলাম। এই ঘরটি খাট পালংক ও নানান আসবাবপত্র দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো। যে জানালা দিয়ে পীর পালিয়েছে সেটা দেখানো হলো আমাকে।

দৈর্ঘ্যে জানালাটি আড়াই ফুট, প্রস্থ্যে দুই ফুট। জানালার চৌকাঠটি মেপে দেখলাম ১৩ ইঞ্চি। জানালার চারপাশের ফ্রেমটি নোংরা ঝুল আর মাকড়সার জালে নোংরা হয়ে আছে।

পীরের দৈহিক যে বর্ণনা আমাকে দেয়া হয়েছে এতে নিশ্চিত করে বলা যায় এত বড় দেহ দুই ফুট প্রশস্ত জানালা গলে বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব। হতে পারে সে কাত হয়ে জানালা পার হয়েছে।

সে ক্ষেত্রে জানালার সমস্ত ঝুল ময়লা তার দেহের ঘষায় পরিষ্কার হয়ে যেতো। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জানালা পরিষ্কার করা হয় না অনেক দিন। অর্থাৎ এখান দিয়ে যে কেউ বের হয়নি এটা নিশ্চিত।

আসামী যে এই জানালা গলে বের হয়নি ঘরের কাউকে এর প্রমাণ দিলাম না আমি। জানালার ওপাশে গোয়াল ঘর এবং প্রশস্ত আঙ্গিনা। জানালার নিচের মাটি কাঁচা। আমি গভীরভাবে পরখ করলাম। না এখানে কারো পায়ের ছাপ নেই। এমন কাঁচা মাটিতে পায়ের ছাপ পড়লে সেটা মুছে ফেলাও অসম্ভব।

'ক্যাপ্টেন সাহেব! আমি জিজ্ঞেস করলাম– 'আসামী এই জানালা পথে বের হয়েছে এটা কি আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ অবশ্যই। ঘরের ভেতরের দরজা খুলে আসামী এই কামরায় আসে এবং তার চোখে জানালাটি নজড়ে পড়ে। এটা দিয়ে সে গোয়াল ঘরের আঙ্গিনায় আসে এবং বড় দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। এছাড়া তো আর কোন পথ ছিলো না।

বাড়ির মূল অংশে চলে গেলাম আমি। এ অংশটি বেশ ঝকঝকে তকতকে। বাড়ির লোকেরা কে কোথায় ঘুমোয় এটাও জেনে নিলাম এক ফাঁকে।

আমি আসলে বের করতে চাচ্ছিলাম ভণ্ড পীর বের হয়েছে কোন দিক দিয়ে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে থাকে সে যেখান দিয়ে বের হোক তো হয়েই গেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ বরং এই নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় যে, আসামী নিজের চেষ্টাতে বের হতে পারেনি। কেউ তাকে বের হতে সাহায্য করেছে। ঐ জানালা দিয়ে সে বের হয়নি।

আমার ধারণা সঠিক হলে তার সাহায্যকারী বাড়ির চাকর বাকর হতে পারে অথবা বাড়িরই অন্য কেউ হতে পারে। এবং এদের কেউ অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকাটাও আশ্চর্যের কিছু হবে না তখন।

আরেকটা ব্যপার হতে পারে, যেটা এখনই বলতে চাই না। সেটা হলো সেই রহস্যময় পীর কোন নিগুঢ় রহস্যের এই বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারে। এমন হলে কাহিনীর প্রতিটি বাক্যই যে চমকের পর চমক সৃষ্টি করে যাবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এবার ঘরের মহিলাদের প্রতি নজর দিলাম। এখানে ক্যাপ্টেনের বৃদ্ধা মা আছেন। ছোট ছেলের ঘরে থাকেন তিনি। আরেকজন হলো ক্যাপ্টেনের বোন।

ত্রিশোর্ধ নরী। তার একটি বাচ্চা আছে। স্বামীর সঙ্গে বনাবনি হচ্ছে না বলে বছর খানেক ধরে বাপের বাড়ি পড়ে আছে। মোটামুটি ধরেনর চেহারা, তবে স্বাস্থ্যটি বেশ অটুট' –লাবন্যময়ী। সব মিলিয়ে আকর্ষণীয় নারী।

তৃতীয় নারী হলো, ক্যাপ্টেনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। ননদের চেয়ে অনেক সুন্দরী। বয়স সাতাস আঠাশ হবে। এদের সবার কাছ থেকেই ঘটনার জবানবন্দি নেবো আমি। শুরু করলাম ক্যাপ্টেনের ভাইকে দিয়ে।

*** *** ***

অনেক দিন ধরেই মানুষের মুখে মুখে কথা ছড়াচ্ছে, আল্লাহর এক বিশেষ বান্দা এখান দিয়ে যাবেন– ক্যাপ্টেনের ভাই বলতে শুরু করলো– কেউ বললো, তিনি পায়ে হেটে হজ্জে যাচ্ছেন এবং পথে যে কেউ তার মনোবাসনার কথা আরয করে সেটা তিনি পূরণ করে দেন।

কেউ বললো, আল্লাহর দরবার থেকে হুকুম করা হয়েছে তাকে যে, বিভিন্ন নগরে শহরে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের মনোবাসনা পূরণ করে। তাকে কিছু না জানালেও তিনি মনের ভেদ এমনিই জেনে নিতে পারেন। তার অলৌকিক কারামতের কাহিনী কেউ শোনালে মানুষের বিশাল জটলা বেঁধে যেতো।

ভণ্ড পীর ফকিরের দাসত্ব মানুষের মধ্য থেকে আজো কমেনি, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রাজত্ব চলছে। সহীহ্ পীর ফকীর যে নেই এমন নয়, তবে তারা সংখ্যায় খুবই কম। ভণ্ড পীরের মুরিদরা তাদের পীরের ক্ষমতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এমন গাঁজাখুরি বাহিনী ফেঁদে বসে, শুনলে মনে হবে সে কোন নবীর চেয়েও বড় কারামতওয়ালা। (নাউযুবিল্লাহ)।

আসলে এসব অতিরঞ্জনের কারণ হলো, নিজেকে নিজের প্রবোধ দেয়া যে, সে যাকে পীর মেনেছে সে লোক আসলেই কামেল লোক। ক্যাপ্টেনের ভাইয়ের অবস্থাও ছিলো এমনই। 'প্রথমত তার বোনের স্বামী-বিচ্ছেদের সমস্যা। দ্বিতীয়ত: তার বিয়ে হয়েছে সাত আট বছর। এখনো বাচ্চার মুখ দেখতে পারেনি। সে আগেই ঠিক করে রেখেছিলো, পীরের পবিত্র পদধূলি এ গ্রামে পড়লেই সে তার কাছে ছুটে যাবে এবং বলবে, তার বোনকে যেন তার স্বামী নিয়ে যায় এবং তাকে একটি সন্তানের ভাগ্য দান করে।

এর মধ্যে একদিন পীরের পদধূলি ঐ গ্রামে পড়লো। এক বাড়িতে তার আস্তানা জমে উঠলো। সে বাড়ি ও বাড়ির আশপাশের রাস্তাঘাট ভক্ত মুরিদদের আনা গোনায় সব সময় সরব হয়ে থাকে।

একদিন এক মহিলা এসে সালাম জানালো। তার দুই ছেলে ইংরেজ সেনাবাহিনীতে গিয়েছে। পীর তাকে দেখতেই বলে উঠলো–

'তোমার দুই ছেলে একেবারে সুস্থ আছে। চিন্তা করো না। ওদের জানের সদকা দিয়ে দাও। ওরা যে বার্মা ফ্রন্টে আছে। একটু বিপদজনক অবস্থায় ছিলো তারা। এখন ভয় কেটে গেছে। আমি একটা তাবিজ দিয়ে দেবো। বাড়ির প্রথম দরজায় লাগিয় দেবে।

সেখানে যারা ছিলেন সবাই হয়রান হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ, পীর সাহেব নিজেই তার মনোবাসনা বুঝে নিয়েছেন। আরো কয়েকজন সৈনিকের মা পীরের কাছে আসে। পীর প্রত্যেকের ব্যাপারেই ঠিকঠাক বলে ঝুলি দেয় যে, তার ছেলে অমুক ফ্রন্টে আছে। নগদ নজরানায় পীরের বলে কয়েক ঘন্টাতেই ভরে যায়।

পীরের সঙ্গে তার দুই শাগরেদও ছিলো। পীর এক ঘরে ধ্যান করে বসে। আর সেই দু'জন পাশের কামরায় অবস্থান নেয়। পীরের সাক্ষাতে কেউ আসলে ঐ দু'জন প্রথমে তার মনোবাসনার কথা জেনে নেয় এবং নির্ধারিত কোন ইংগিতে পীরকে জানিয়ে দেয় যে এই মক্কেল এই এই সমস্যা নিয়ে এসছে। পীর মক্কেলকে দেখেই তার মনের সব কথা তার সামনে তুলে ধরে। মক্কেলের তখন বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

ক্যাপ্টেনের যার নাম আমি সুবিধার জন রেখেছি 'আদালত'। আদালত এসব কারামত দেখে ভাই পীরকে তার বাড়িতে নিয়ে এলো।

পীর এত বিশাল হাবেলি দেখে বুঝে ফেললো, এদের অনেক পয়সা আছে। কিছু হাতিয়ে না নিয়ে মনে শান্তি পাবো না।

'তুমি তো খুব সামান্যই চেয়েছো– পীর তাচ্ছিল্য করে বললো– এখানে শাহে সুলাইমান (আ) এর ধণভাণ্ডার চাপা পড়ে আছে। তোমরা এর ওপর দিয়ে চলাফেরা করছো...... তোমার সন্তান কেন হবে না। অবশ্যই হবে..... আর তোমার বোনের চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। এই চাঁদের পূর্ণিমাতেই ওর স্বামী এসে ওকে নিয়ে যাবে। এমনিতে ওর স্বামীকে খেপাটে মনে হলেও ভেতর ভেতর সে খুবই অনুতপ্ত। আজ রাতে তোমার বোন ও স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তবে ওদের দেহ যেন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়। উভয়েরই অযু করে আসতে হবে।'

'শাহে সুলাইমানের খাযানার কথা কী বললেন যেন সরকার'!– আদালত চরম হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'অনেক পুরনো খাযানা'– পীর রহস্যভরা গলায় বললো– 'শত শত বছর পেরিয়ে গেছে। খাযানা কোথায় আছে এটা আমাদের দেখতে হবে। পুরনো খাযানা বা ধণভাণ্ডার মাটির নিচে দাফন করা থাকলে সেটা আপনাআপনি চলা ফেরা করে। জিন বা কালনাগের প্রহরা এর ওপর অবশ্যই থাকে। এ অবস্থায় এর ওপর হাত দেয়া আমাদের পক্ষ্যে সম্ভব হবে না। অনেক কিছু করতে হবে। এই বাড়ির মাটি আমাকে বলছে, তার পেটে সোনার ভাণ্ডার আছে।'

*** *** ***

ধণ ভাণ্ডার বা গুপ্তধনের গল্প কাহিনীতে মানুষের আগ্রহ খুব বেশি। এর অর্থ হলো অধিকাংশ মানুষই হাস্যকর হলেও মনের গোপন কোনে এ স্বপ্ন লালন করে যে, একদিন যদি কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যেতাম তাহলে ভাগ্য ফিরে আসতো।

মানুষের আরেকটি বিশ্বাস আছে, এসব খাযানা বা গুপ্তধনের সন্ধান একমাত্র জাদুকর বা কামেল পীররাই দিতে পারে। তাই খাযানার কথা শুনে আদালতের ভেতরও হাজারো রঙ্গীন স্বপ্ন মাথা চারা দিয়ে উঠে। পীরকে তার মনে হয় আকাশ থেকে নেমে আসা কোন ফেরেশতা।

'গুপ্তধনের কথা শুনে তুমি তো বেশ খুশি হয়েছো'– পীর আদালতকে বললো– 'কিন্তু তুমি তো এটা জানো না যে, এই খাযানা যতদিন তোমাদের বাড়ির মাটির নিচে থাকবে ততদিন তোমাদের ঘর থেকে অশুভতা দূর হবে না। তোমার বোন ঘরে পড়ে আছে আর তোমার স্ত্রীর কোল খালি। এটাও একটা কুলক্ষণ।'

'ঐ খাযানা যদি বের হয়ে আসে তাহলে কি সেটা উদ্ধার করে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে?'– আদালত জিজ্ঞেস করলো।

'না, খাযানা বের হয়ে এলে এর অশুভতা দূর হয়ে যাবে এবং এর মালিক হবে তখন তুমি'– পীর বললো।

আদালত, আদালতের বউ ও তার বোন তো আগ থেকেই পীরের নানান উড়ো উড়ো কারামতের কথা শুনে তার ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। যখন 'খাযানা' এর আওয়াজ পৌঁছলো ওদের কানে, তখন তো সবাই পীরের 'দরবারে' এসে মাথা ঠুকতে লাগলো।

পীর জানিয়ে দিলো, এ ঘরে তাকে ছয় সাত রাত চিল্লা করতে হবে। রাত জাগতে হবে। তবে শর্ত হলো কোন কিছুর প্রয়োজন হলে সে মুখ থেকে শব্দ

বের করতে পারবে না। শুধু তালি বাজাবে। তখন ভেতরে শুধু নারীরাই আসতে পারবে। তবে অযু করে সম্পূর্ণ পবিত্র অবস্থায়।

একথা বলে পীর ধ্যান করে কি একটা হিসাব নিকাশ করলো। তারপর বললো, এ বাড়িতে যার নাম 'তা' অক্ষ্যর দিয়ে শুরু সেই ভেতরে আসতে পারবে।

আদালনের স্ত্রীর নাম ছিলো তাজ বেগম। তাজ দরুণ খুশি হলো। এত বড় আল্লাহর পিয়ারা বুযুর্গের খেদমতের জন্য তাকে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সে রাতেই চিল্লা শুরু হয়ে গেলো। তাজকে পাশের কামরার দরজায় পৌঁছে দেয়া হলো।

আদালতকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। পীর সাহেব তাজকে প্রতি রাতে কতবার করে ডাকতো। আদালত জানালো, সে শুয়ে পড়তো, সকালে তাজ তাকে বলতো, পীর ওকে রাতে দু'তিনবার ডেকেছিলো।

পীর ঘোষণা করে দিয়েছিলো, চিল্লা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী কোন উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্য তার কাছে আসতে পারবে না। দিনের বেলা তার শাগরেদ দুজন কেবল ভেতরে আসতে পারতো। রাতে ওদেরও ভেতরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না।

এভাবে চলতে লাগলো। পীর ও দুই শাগরেদকে প্রতিদিন রসালো খাবার দেয়া হতে লাগলো। প্রতিদিন তিন কেজি দুধ, ঘিয়ে ডুবিয়ে পরটা ভাজা এবং আস্ত একটা মুরগি পীরকে খাওয়ানো হতো।

ঐ বাড়ির সামনে বহু সাক্ষাতপ্রার্থী প্রতিদিন ভিড় করতো। পীরের সাক্ষাতের জন্য আদালত ও পীরের শাগরেদের কাছে মিনতি করতো। শিশু বাচ্চা নিয়ে অনেক মহিলাও বাড়ির বাইরে সারাদিন কাটিয়ে দিতো। কিন্তু পীরের দৃষ্টি কারো ভাগ্যে জুটলো না।

'পুরো আটটি রাত সে চিল্লা করলো'– আদালত জানালো– 'সত্য কথা বলতে কি আমিও খুব উৎফুল্ল ছিলাম যে, আমার বাড়ি থেকে গুপ্তধন উদ্ধার করা হচ্ছে। চিল্লা শেষ করে পীর আমাকে বললো, সে গুপ্তধনে হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ, শাহ সুলামযানের এক জিন গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে।'

আদালত তখন পীরের হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করলো, যেভাবেই হোক তাকে এই খাযানা উদ্ধার করে দিতে হবে। সে তাকে হাতভরে নযরানা দিবে। যে করেই হোক জিন এখান থেকে হটিয়ে দিন।

'জিন আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, খাযানার কাছে না যেতে'– পীর আদালতেক বলে– আমি তাকে রাজি করতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাকে রাজী করা এত সোজা নয়। আমি তাকে অন্ধ করতে পারি, শাস্তি দিতে পারি।

কিন্তু এতে আমাদের প্রাণের আশংকা রয়েছে'– একথা বলে সে দু'বার বললো– আমি অবশ্যই পারবো, পারতেই হবে আমাকে।'

যা হোক আদালত ও তার স্ত্রী তাজ পীরকে খাযানা উদ্ধারের ব্যপারে বাজী ধরলো পাঁচশ টাকার বিনিময়ে। তখনকার পাঁচশ এখনকার বিশ হাজার টাকার চেয়ে বেশি। সঙ্গে ছিলো দুটি ঘোড়া, আরো দামী দামী কাপড় ও সোনার জরি দিয়ে তৈরী নাগরা জুতো।

পীর জানালো, আরো কয়েক রাত চিল্লা করতে হবে। আদালতের কাছ থেকে সে আরো শ'খানেক টাকা নিয়ে তার দুই শাগরেদকে দিয়ে শহরে পাঠালো। তারা প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস পত্র আনবে। তারা তখনই রওয়ানা হয়ে গেলো এবং সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলো।

আদালত জানলোও না তারা কি কিনে নিয়ে এসেছে।

পীর আদালতকে নির্দেশ দিলো, সন্ধ্যায় তার স্ত্রীকে গোসল করিয়ে লালপাড়ের লাল কাপড় পরিয়ে তার কামরায় পাঠিয়ে দেবে। তবে সমসময় তাকে অযু অবস্থায় থাকতে হবে।

'এই মহিলা আমার কাছ থেকে সাত কদম দূরে বসে থাকবে। আর তার মনে শুধু আল্লাহর নামই থাকবে'– পীর বলেছিলো।

*** *** ***

আদালত বড় আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে তার স্ত্রীকে পীরের কামরায় পাঠিয়ে দিলো। পীর তাকে সঙ্গে নিয়ে তিন রাত চিল্লা করলো। সকালের সূর্যোদয়ের আগেই তাজ তার কামরা থেকে বের হয়ে যেতো।

চতুর্থ দিন পীর কোদাল চাইলো। আদালত ঘটনা বর্ণনার সময় জানালো, ভেতর থেকে কোদাল চালানোর আওয়াজ আসতে লাগলো। তারপর এই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো। প্রায় এক ঘন্টা পর দরজা খুললো। ঘরের সবাইকে সে কামরায় ডেকে আনলো। এক জায়গায় মাটি খোদাই করা দেখা গেলো। আদালতকে বললো, এখানে আরা কোদাল চালাও।

আদালত তিনবার কোদাল মারলো। চতুর্থবার এমন আওয়াজ পাওয়া গেলো যেন কোন ধাতব কিছুর ওপর কোদাল পড়েছে।

'থামো!– পীর বললো তখন– এখন হাতে মাটি সরাও।'

আদালত হাতে মাটি সরালে ইস্পাত বা লোহার চকচকে কিছু দেখতে পেলো। আদালত হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো বিস্ময়ে এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে গিয়ে বললো–

'ইয়া সরকার! এতো কোন বাক্সের তালা মনে হচ্ছে!'

'ভালো করে দেখো' পীর বললো।

আদালত আরো মাটি সারালো।

'এটা একটা ঢাকনা'– পীর বললো– 'একটা ডেকের ওপর রাখা আছে এটা....... সবাই ভালো করে দেখো।'

আদালতের মা বোন স্ত্রী সবাই ঝুঁলে দেখলো। ডেগের ঢাকনা মাটির সাথে আটকে আছে। পীর কোদাল নিয়ে তার ওপর আস্তে আস্তে টোকা দিলো। শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছিলো, এর নিচে কিছু এটা আছে।

'এখন আর এর চেয়ে বেশি খনন করতে পারবে না'– পীর বললো– 'আগামীকাল রাতে গ্রামের সবাই যখন শুয়ে পড়বে তখন তোমরা খনন শুরু করবে। আজ রাতে ঐ ঘরে প্রদীপ জালিয়ে রাখো। আজ রাতে আমি এখানে থাকবো না। শাহে সুলাইমানের দরবারে আমাকে হাজিরা দিতে হবে। তোমরা আমাকে দিয়ে একটি পাপ করিয়েছো। খাযানায় যে জিন প্রহরায় ছিলো তাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমার জন্য জরুরী কাজ হলো, শাহে সুলাইমানের দরবারে গিয়ে মাফ চাওয়া। না হলে সবার অপঘাতে মৃত্যুর আংশকা রয়েছে।'

'শাহে সুলাইমানের দরবার কত দূর হুজুর'?– আদালত জিজ্ঞেস করলো।

'এ ভেদ তুমি সহ্য করতে পারবে না– পীর চোখ বড় বড় করে বললো- 'আমি যা দেখতে পাই তুমি তো তা দেখতে পারো না। এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভালো। আগামীকাল সন্ধ্যায় তোমাদের কাছে চলে আসবো'– পীর এমনভাবে কথা বলছিলো যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

পীর বলতে লাগলো, এই খাযানার ব্যপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে খাযানা দিয়েছেন তোমরা কখনো তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। তোমাদের খাযানার দরকার ছিলো আমি তা বের করে দিয়েছি...... এখন তা বের করে ভোগ করো'।

পীর চলে গেলো। আদালত তখনই সে ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলো.... সে দিনটি এবং রাতটিও কেটে গেলো। পরদিনও চলে গেলো। পীর ফিরে এলো না। তার দুই শাগরেদ পীরের সঙ্গেই চলে গিয়েছিলো।

সেদিন সন্ধ্যায়ই আদালতের ক্যাপ্টন ভাই ছুটিতে বাড়িতে আসলো। বাড়ি এক হলেও ক্যাপ্টনের হিসসা প্রাচীর দিয়ে পৃথক করা। আদালত খবর পেয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। এর আগেই ক্যাপ্টেনের স্ত্রী ক্যাপ্টেনকে পীরের কহিনী যতটুকু জানে বলে দিয়েছিলো।

ক্যাপ্টেন আদালতকে দেখে পীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। আদালত পীরের কারামতের কিছু কাহিনী শুনিয়ে বললো, পীর তো তার ঘরে গুপ্ত ধনের মুখ খুলে দিয়ে গেছে। আজ রাতে গুপ্তধন বের করা হবে।

রাতে ক্যাপ্টেনও আদালতের ঘরে গেলো। আদালত তাকে খাযানার ঘরে নিয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন আদালতকে খনন কাজ শুরু করতে বললো। আদালত ঢাকনার ওপর থেকে মাটি সরালো এবং ঢাকানাও উঠিয়ে নিলো। কিন্তু এর নিচে কিছুই ছিলো না। আদালত পাগলের মতো কোদাল চালাতে লাগলো। কিন্তু কাঁদা মাটি ছাড়া আর কিছুই বের হলো না।

ক্যাপ্টেন বুঝে ফেললো, তার ছোট ভাই প্রতারণার শিকার হয়েছে। ঢাকনাটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে সবাইকে বললো, এতো এ যুগের বানানো থলে বা ঢাকনা।

আদালতের মায়ের হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়লো। ঘরের এক দিকে রাখা বড় একটি ডেগচি দেখিয়ে বললো, 'এই ঢাকনা তো ঐ ডেগচির'।

আদালতের বোন ও স্ত্রীও থালাটা চিনতে পারলো। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছাড়া কিছুই করার ছিলো না তাদের।

*** *** ***

আমার মাথায় একটা সম্ভাবনা উদয় হলো যে, আদালতের গ্রামে নিশ্চয় পীরের সহমর্মী কেউ আছে। কিন্তু এ সন্দেহটা পোষণ করতে মনে সায় দিচ্ছিলো না। কারণ এ পরিবার প্রতারণার শিকার হয়েছে। তবে চাকর বাকর হয়তো পীরকে পালাতে সাহায্য করেছে।

'ক্যাপ্টেন সাহেব'! আদালতের বড় ভাইকে বললাম– 'আসামী মনে হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ংকর। একে তাড়াতাড়ি ধরতে না পারলে এ এলাকায় প্রতরণাসহ আরো অনেক বিপদজনক অপরাধকর্ম সংঘটিত হতে পারে। শুধু আপনার ভাই-ই নয় পুরো এলাকার প্রতি আমি সহমর্মী। আমার দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনার ভাইয়ের পরিবারের মেয়েদেরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন পড়বে। এরা সবাই আমার মা বোনের মতোই। এটা আমার পেশা ও আত্ম মর্যাদাবোধের প্রশ্ন। আপনি সেনা অফিসার। পেশাগত দায়িত্ব কি জিনিস আপনি সেটা জানেন।'

'জনাব, আপনার জন্য সম্পূর্ণ অনুমতি আছে'– ক্যাপ্টেন বললো– 'শুধু অনুরোধ করবো, জিজ্ঞাসাবাদ আমার ঘরে বা আমার ভাইয়ের ঘরে করবেন। আরেকটা অনুরোধ, খাবার খেতে হবে কিন্তু আমার ঘরে।'

'ঘরের চাকর নওকরদের আমার কাছে সোপর্দ করুন।'

দুই নওকরকে পাঠানো হলো আমার কাছে। রাতে ওরা কোথায় ঘুমোয় ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। একজন বললো, নিজের বাড়িতে ঘুমোয়। আরেকজন এ বাড়ির উঠোনের মথায় ছোট একটি ঠাকুরীতে ঘুমোয়। যে রাতে পীর পালিয়েছে সে রাতেও সে ওখানেই শুয়েছিলো।

নওকরকে নিয়ে আমি তার থাকার জায়গাটি দেখতে গেলাম। গরু মহিষের গোয়ালের কাছে একটি নিম গাছের তলায় তার ঘর। তার ঘর থেকে বাড়ির প্রধান দরজা আট কদম দূর। সে প্রতিদিন ফজরের আযানের আওয়াজ শুনে জেগে উঠে এবং মহিষগুলোকে দানা পানি দেয়।

প্রধান দরজা রাতে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। সকাল বেলা সেই দরজা খুলে দেয়।

প্রধান দরজাটি বেশ প্রশস্ত ও অনেক উঁচু। বড় মোটা শিকল দিয়ে লাগানো হয়। ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, সকাল বেলা উঠে দেখেন ঐ জানালা এবং দরজার শিকল খোলা।

'ভালো করে মনে করে দেখো'– নওকরকে বললাম– 'আজ সকালে কি দরজা তুমি খুলে ছিলে না নাকি জেগে উঠে দেখেছো দরজার শিকল খোলা?'

'আমার ভালো করেই মনে আছে হুজুর! শিকল আমি নিজ হাতে খুলেছি।'

'এ বাড়িতে একজন পীর এসেছিলো সেটা কি জানো তুমি?'

'জানি হুজুর! অনেক দিন ছিলেন এখানে। কাল উনাকে এখানে ধরে এনেছিলো। তাকে নিয়ে অনেক হৈচৈ হয়েছে গ্রামে। কাপ্তান সাব ও তার ভাই সাব আরো অনেকে মিলে উনাকে অনেক মারপিট করেছিলো। আজ সকালে মহিষগুলোকে দানা পানি দিচ্ছিলাম। তখন চৌধুরী সাব (আদালত) এদিকে এলেন।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাল রাতে আমি কোথায় শুয়েছিলাম। আমি বললাম এখানেই। আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না আমাকে। তবে কয়েকটি গাল দিয় চলে গেলেন। এরপর কাপ্তান সাবও এলেন। আমি তাকে বললাম, দরজার শিকল তো লাগানো ছিলো, পীর এখান দিয়ে কি করে যাবে....... হুজুর! আমরা গরীব আদমী! গালি খাওয়াই আমাদের কাজ। আমি উনাকে আর কিছু বললাম না। তিনি চলে গেলেন।

*** *** ***

নওকরকে ওখানেই রেখে বাইরে এসে ক্যাপ্টেন ও আদালতকে একদিকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

সকালে উঠে বড় দরজার দিকে গিয়ে কি দরজা খোলা দেখেছে তারা? নাকি নওকারকে এ ব্যপারে জিজ্ঞেস করেছে যে, সকালে উঠে সে দরজার শিকল খোলা পেয়েছে না বন্ধ পেয়েছে?

এক ভাই আরেক ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো। তারা হয়রান হয়ে উঠলো।

'শিকল লাগানো ছিলো, নওকর কি আপনাদেরকে একথা বলেছে?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ জনাব!– আদালত বললো।

'আচ্ছা আপনাদের নওকার কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?'

'ষোলআনা জনাব! কেন সে কি কিছু করেছে?– আদালত পেরেশান হয়ে গেলো।

'এটা সময়মতো জানা যাবে। সে কিছু করে থাকলেও সেটা জরুরী কিছু হবে না। আমি শুধু বলতে চাই আসামী ঐ জানালা পথে বের হয়নি। সে তো পেছনের উঠোনেই যায়নি।'

জনাব; সকালে তো আমরা জানালা খোলা দেখেছি। সবসময় তো সেটা বন্ধই থাকতো'– আদালত বললো।

'এছাড়া তো অন্যকোন পথও ছিলো না ইনস্পেক্টর সাহেব!– ক্যাপ্টেন বললো– 'বড় কামরার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিলো। আর বাইরের দরজা ভেতর থেকে ছিলো বন্ধ। সে জানালা দিয়েই পালিয়েছে।'

'আসামীর শারীরিক আকৃতি আপনাদের দু'জনের মধ্যে কার সঙ্গে মিলে?' আমি অযথা তর্কে না জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

'আমার সঙ্গে মিলে সে আমার চেয়ে একটু মোটাও বেশি হবে। কম হবে না'– আদালত বললো।

দু'জনকে জানালাওয়ালা কামরায় নিয়ে গেলাম। দেখলাম, জানালার ফ্রেম জুড়ে ঝোল কালি লেগে আছে। তারপর আদালতকে বললাম, জানালা দিয়ে সে যেন ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

আদালত মাথাটুকুই কেবল ঢোকাতে পারলো, কাঁধ জানালার ফাঁকে ফেসে গেলো। সে কাঁধ ওপর নিচ করলো। বহু কষ্টে কাঁধ বেরও হয়ে গেলো, কিন্তু

শরীর? কেটে বের করতে হবে। আদালতকে নেমে আসতে বললাম। সে অনেক্ব কসরত করে জানালা থেকে নেমে এলো।

'এখন দেখুন, জানালার আশেপাশের ঝোল ময়লা দেখিয়ে বললাম– দেখুন তো ময়লাগুলো আছে কি? আপনার জামা দেখুন..... আসামী এদিক দিয়ে গেলে ধুল ঝোল পরিষ্কর হয়ে যেতো। আপনার কাপড় নোংরা হতো না। কাপ্তান সাহেব! সে এদিক দিয়ে যায়নি। এজন্য আপনার নওকরের ওপরও সন্দেহ জাগে না যে, সে আসামীকে এদিক দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।'

'আমাদের তো জনাব সৈনিকের মাথা!– ক্যাপ্টেন বললো– 'এত সুক্ষ্ম বিষয় ভাই আমরা বুঝবো কি করে।

কিন্তু আদালত ও ঘরের মহিলাদেরও বক্তব্য, বড় কামরার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। তাহলে সে গেলে কোন দিক দিয়ে?'

'আমাদের ব্যবস্থা এত পাকা ছিলো যে, রশি দিয়ে তার হাত পা বাধার প্রয়োজন বোধ করিনি'– আদালত বললো।

'সোজা কথা হলো– ক্যাপ্টেন বললো– রশি দিয়ে হাত পা বাধার কথা মনেই আসেনি। এমন রাগ ছিলো যে, মাথা বিগড়ে যাবার মত অবস্থা। আদালত তো চেয়েছিলে ওকে হত্যা করে লাশ দাফন করে আসবে কোথাও। আমি ওকে এথেকে বাধা দিই যে, একাজ করলে তোমারও ফাঁসি হয়ে যাবে।'

'জনাব, আদালত অন্য সুরে বললো– পীর আমাদেরকে অনেক বড় ধোকা দিয়েছে ঠিক, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তার কাছে এমন কোন বিদ্যা আছে, যার জোরে সে এখান থেকে অনায়াসেই বের হয়ে গিয়েছে। আমরা তাকে বেঁধে ফেললেও সে বাঁধন খুলে ফেলতো।'

'হ্যাঁ, এছাড়া তো তার পলানোর আর কোন পথ নেই'– ক্যাপ্টেনও সায় দিলো।

'তার কাছে কোন বিদ্যা আছে কিনা, এটা আবার এখন জানার বিষয় নয়, পরে দেখার দরকার হতে পারে। একথা বলে আমি আমার নওকরের কাছে গেলাম।

আমি নওকরকে আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করলাম। তবে তার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম, বাড়ির ভেতরগত কথা তার খুব একটা জানা নেই। তাকে এটাও জিজ্ঞেস করলাম। আদালতের বোনের তার স্বামীর সঙ্গে কিসের ঝগড়া?

'আমরা চাকর নওকররা তো এটাই জানি যে, বিবি সাহেব নিজের দেমাগ দেখিয়ে চলতো, কিন্তু তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বলতো, তাদের দেমাগই উঁচু। অন্যকান কারণ নেই'– নওকর বললো।

'ওর চালচলনে ওর স্বামীর সন্দেহ ছিলো?'

'না হুজুর! আমরা এখনো এমন কোন কথা শুনতে পাইনি। উনার স্বামী উনাকে মনে প্রাণে চান। আমার মা আমাকে বলেছে, উনার শাশুড়ি সুবিধার মহিলা নয়। গ্রামের গরীব লোকদের ওপর এমন জোরজবস্তি করে যেন সেই দেশের রানী– নওকর বললো।

'তুমি এত নিশ্চিত করে কি ভাবে বলছো যে, চৌধুরীর বোনের চালচলন ঠিক আছে?'

'খারাপ হলে তো জানতেই পারতাম– নওকর বললো– 'বিবি তো কখনো বেরই হয় না'।

আর ঘরেও তো ভিন্ন পুরুষের আসা যাওয়া নেই।

'চৌধুরী (আদালত) সাহেবের স্ত্রী কেমন?'

'জ্বি হুজুর! ইনিও ঠিক আছেন।'

আসামী সম্পর্কেও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু নওকর কিছুই বলতে পারলো না। তার সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। অন্য নওকরও কোন কিছু বলতে পারলো না?

*** *** ***

রাত হয়ে গিয়েছিলো। গ্রামেই রয়ে গেলাম। তবে ঘুমুনোর সুযোগ হয়নি। এ ধরনের কেসে পুলিশের নিজস্ব ঝামেলাও মেলা। অন্যান্য থানায় আসামীর সনাক্তকরণ রিপোর্ট পাঠাতে হয়। যাতে যেকোন এলাকা থেকে আসামীকে সহজে ধরা য়ায়। আমি আই.এস.আই-কে থানায় খবর পাঠিয়ে দিলাম। এ কাজগুলো যেন দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

রাতে বাড়ির বৈঠকখানায় আদালতের বোনকে নিয়ে বসলাম। আদালতের বোনকে বললাম,

'তুমি আমাকে থানাদার মনে করো না। ওর ভয় দূর করার জন্য বেশ সহানুভূতির গলায় তার স্বামী ও সংসারের খুটিনাটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম। ইচ্ছে করেই তার স্বামীর বিরুদ্ধে বলতে লাগলাম।

সে আমাকে দু'দন্তও এগুতে দিলো না। নিজের স্বামীর প্রশংসা শুরু করে দিলো। যত আপত্তি তার শাশুড়িকে নিয়ে। আদালতের বোনের দাবী, তার শাশুড়ি হলো সারাক্ষণ ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে আনন্দ পাওয়া এক বিকৃতি রুচির মহিলা।

আমার চোখে মুখে সহমর্মিতা, আগ্রহ ফুটিয়ে তুলে তার কথা শুনতে লাগলাম। সেও সহজ ভঙ্গিতে অসংকোচে তার ভেতরে জমে থাকা কথার স্তূপ উগড়ে দিতে লাগলো। আশা করছিলাম, কথায় কথায় সে পীর সম্পর্কে এমন কিছু কিছু বলে বসবে, যা আমার জন্য বেশ কাজের হবে।

স্বামীর ব্যপারে 'ও আজো অন্ত-প্রাণ। দু'জনে দু'জনকে তীব্রভাবে চায়। একবছর হলো সে বাপের বাড়ি আছে। এর মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সাত আটবার মিলন হয়ে গেছে। তবে স্বামী স্ত্রীর মতো নয়। গোপন প্রেমিক প্রেমিকার মতো। যেন অভিসারিকায় পাওয়া দুই নারী পুরুষ।

রাতের অন্ধকার গ্রামের বাইরে ঘন বন বৃক্ষ এলাকায় ওদের অভিসার হয়েছে। এ থেকেই আমি বুঝতে পারি যে, তার স্বামী নিজের মায়ের ঝগড়াটে স্বভাবকে ভীষণ ভয় পায়। নিজের স্ত্রীকে এত ভালোবেসেও মুখ ফোটে মাকে বলতে পারে না।

'তোমাদের ঘরে যে পীর এসেছিলো তাকে নিশ্চয় তোমার শাশুড়ির কথা বলেছো'– আমি বললাম।

'পীর নিজেই একথা বলে দিয়েছিলো'– সে বললো– 'আমি তো হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মুখ দেখেই আমার মনের কথা বুঝে নিয়েছিলো। গায়েব সম্পর্কে জানতো কিভাবে? বলেছিলো তাবিজ দেবে আমাকে।'

'তাবিজ দিয়েছিলো?'

'না' এখন তো সবাই জেনে ফেলেছে পীর আসলে ধোকাবাজ ছিলো। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো'– সে থেমে গেলো এবং তার মাথা আনত হয়ে গেলো।

এ এলাকায় পীরদের পীরানীর ঘটনা ও মামলা আমার হাতে আরো কয়েকটি পড়েছিলো। আমার মনে আছে, তাদের মুরিদদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় একটা পর্যায়ে এসে মুরিদের মাথা এভাবে ঝুকে পড়তে দেখেছি।

মমতাময়ী হাতে আমি তখন তাদের পড়ন্ত মাথাটি উঠিয়েছি এবং মুখ থেকে সে কথা বের করে এনেছি যা তাদের মাথা নত করে দিয়েছে। আদালতের বোনের নতমুখী অবস্থা তাই আমার জন্য নিরর্থক বিষয় ছিলো না।

'আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না বিবি'– আমি তার মাথাটি উচু করে নরম গলায় বললাম– 'আমি জানি, কোন কথাটা মুখে উচ্চরণ করতে তুমি লজ্জা পাচ্ছো। আমাকে ভাই বন্ধু যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারো। পুলিশ অফিসার মনে করো না। এসব কথা আমার রিপোর্টে যাবে না। আমার অন্তরে লিপিবদ্ধ থাকবে।'

'আমি সে পর্যন্ত যেতে দেয়নি'– সে ফিস ফিস করে বললো– 'সে আমাকে একলা নিয়ে বসেছিলো এবং আমার মাথায় হাত রেখে পুরো শরীরে হাত বুলিয়েছিলো।'

পীরের কাছে বসার দুদিন আগেও নাকি তার স্বামীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত হয়েছিলো। সেদিন বাকি রাত সে কেঁদে কেঁদে কাটায়। তার মাথায় পেরেকের মতো একটা বিদ্ধ হতে থাকে, তুমি তোমার স্বামী ও নিঃষ্পাপ সন্তানের ইযযত।

'আমি পীরকে বললাম, আপনি তো গায়েবী শক্তির অধিকারী, আল্লাহর ওলী। এক মিহলার ব্যপারে আপনার এমন অপবিত্র মনোভাব থাকা উচিত নয়'– আদালতের বোন আমাকে বলল– আমি পীরকে এ কথাও বলেছি।

আপনার যদি দুনিয়ার প্রতি এতই লোভ থাকে তাহলে আমার কাছে পয়সা চান, অলংকার চান। আপনি আমার ইযযত নিতে চান, এতো আমার স্বামীর সংরক্ষিত ইযযত। যান আপনি তার কাছে চান'।

'আচ্ছা! আমাকে একটা কথা বলো তো', আমি বললাম– 'পীরকে মানুষ এমনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করে যে, মহিলারা নিজেদের ইযযত নযরানা দেয়াটাও পাপ মনে করে না। তাহলে তোমার মনে কি করে আসলো যে, পীরের চেয়ে তোমার স্বামীই অনেক ভালো?'

'আপনি ভালো মন্দের কথা বলছেন'– সে বললো– 'আমার তো একটা কথা বুঝে আসে না। যিনিই পীর হবেন তার সম্পর্ক সবসময় আল্লাহর সঙ্গে থাকবে। খোদার নিকটজন হলো পীরেরা।

যদি একথা ঠিক হয়ে থাকে তাহলে নারীদের প্রতি পীরদের অবৈধ দৃষ্টি কিভাবে পড়ে? অন্য কেউ নারীদের ওপর নজর দিলে সবাই তাকে বদ চরিত্র বলে; কিন্তু পীরের বেলায় কেন তা সচ্চরিত্র হয়ে যায়?'

গ্রাম্য নিরক্ষর এক মেয়ে, শিক্ষার কোন শব্দ ছিলো না তার কাছে। এজন্য সে গুছিয়ে বলতে পারছিলো না যে, পীরকে কেন সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার সাফ কথা হলো, তার ভেতর থেকে এক আওয়াজ আসে, এ লোক কমপক্ষে এ মুহূর্তে ওয়ালি জাতীয় কোন কিছু না; যৌন লিপসায় আক্রান্ত এক ব্যক্তি।

পীরকে সে আর কিছু বললো না। কামরা থেকে বের হয়ে এলো।

'এবার আমার ভাইকে বলতে চেয়েছিলাম'– সে বললো– 'কিন্তু আমার ভাই, ভাবী ও আমার মার ওপর পীরের জাদু বিদ্যা এমনভাবে চেপে বসেছিলো যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলকেও ভুলে গিয়েছিলো। পীর গুপ্তধনের কথা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে পাগল করে দিয়েছিলো। যদি নালিশ করতাম, পীর বদকার লোক, ভাই আমাকে মেরেই ফেলতো।

অন্যরা আমাকে অভিশাপ দিতো, পীরের কৃপা দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। আমি তাই মুখ বুঝে দেখতে থাকলাম কি হয় না হয়। তারপর তো দুধ থেকে পানি পৃথকই হয়ে গেলো।'

*** *** ***

আদালতের বোনটিকে এক কথায় সুন্দরী বলা যায়। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কাছে মনে হলো, এই মেয়ের ভেতর আল্লাহর গায়েবী নূর আছে। যার কদীপ্তিতে তার চোখে মুখে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার কথাগুলো আমার গভীরে গেঁথে যাচ্ছিলো।

'তোমার ভাই আদালত বলেছে, তার স্ত্রী পীরের খেদমতের জন্য রতে পীরের সঙ্গে থাকতো'- আমি বললাম- এ ব্যাপারে তুমি কিছু বলতে পারো?...... তোমাকে আরেকবার বলছি, তুমি আমাকে যা বলবে তা আমার অন্তরেই থাকবে। এটাও শুনে রেখো, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সে প্রতারণা করেছে। তার পাঁচশ টাকারও বেশি মেরে দিয়েছে।'

'এক হাজার টাকারও বেশি জনাব'; সে বললো- ভাইকে সবচেয়ে বড় ধোকা তো দেয় সে। ভাবী তাজকে পীরকে নিজের সঙ্গে রাখতে দেয় ভাই পীরের কথায় ধোকায় পড়ে। আপনাকে আমি আর কি বলবো? এক মেয়ে আরেক মেয়ের মুখ দেখেই তার মনের কথা পড়ে নিতে পারে।'

'তুমি তাকে বাঁধা দিলে না?'

'সে তো আমাকে এমনিই ভালো চোখে দেখে না'- সে বললো- 'এ ধরনের কিছু আমি তাকে বলতে গেলে ঘর থেকেই বের করে দিতো আমাকে সে।'

'একটা কথা আমাকে ভেবে চিন্তে বলো তো- আমি বললাম- 'তোমার ভাইয়েরা যে বলে পীর জানালা পথে পালিয়েছে, তোমার কাছে কি সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?'

'এ ব্যাপারে মোটেও ভাবিনি আমি। ঐ কাফের ভণ্ড ধরা পড়েছে। তাকে আচ্ছামতো শায়েস্তা করা হচ্ছে –এই আনন্দেই তো ডুবেছিলাম আমি।'

'তা ও কি খুশি ছিলো?' –প্রশ্নটি মাথায় আচমকা আসলো।

'তার অবস্থা তো প্রায় মরে যাওয়ার মতো হলো'- সে জবাব দিলো- 'চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো, শুধু ঐ ভণ্ডকেই নয় তাকেও তার সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে। তবে খুশি হয়েছিল ভাইজান।'

আদালতের বোনকে বিদায় করে দিলাম। এলাকার চৌকিদারকে ডাকলাম। চৌকিদার এই বংশেরই লোক। এজন্য আমি আশাও করিনি সে এদের বিরুদ্ধে

কিছু বলবে। চৌকিদার নিজেকে বাঁচানোর জন্য অনেক কিছুই বললো। ফাকে ফাকে দু' চারটা মিথ্যাও বললো। বুঝতে পারলাম সেও পীরের জাদুতে আক্রান্ত হয়েছিলো।

'আজ হোক কাল হোক আমাকে একটা কথা বলতে হবে তোমার'– কঠিন সুরে বললাম চৌকিদারকে– 'আসামী যখন এ গ্রামে পীর হয়ে আসে অন্য গ্রামের লোকেরাও প্রতিদিন এখানে আসা যাওয়া করতো। তুমি কি তাদের মধ্যে পেশাদার অপরাধীদের দেখেছো? যারা আসামীর সঙ্গে বা তার লোকের সঙ্গে কথা বলছিলো বা বসেছিলো?'

সে চিন্তায় পড়ে গেলো। কোন উত্তর দিতে পারলো না। তাকে আমি বললাম, ভালো করে মনে করে দেখো। দরকার হলে গ্রামবাসীকে জিজ্ঞেস করে আমাকে জানাবে।

অর্ধ রাত হয়ে গিয়েছিলো। আমি শুয়ে পড়লাম।

*** *** ***

খুব সকালেই আদালতের স্ত্রী তাজকে ডাকলাম। আমি তার ভীত অবস্থা দূর করার চেষ্টা করলাম না। নিশ্চিত ছিলাম, আসামীর সঙ্গে এ রাত কাটিয়েছে এবং সে পবিত্র মেয়ে নয়। এরপরও সে আসামীকে সত্য পীর মনে করে ।

'তোমাকে একটি কথা বলে দিচ্ছি তাজ'!– গম্ভীর কণ্ঠে বললাম– 'তুমি আমার কাছে কিছুই লুকোতে পারবে না। ঐ পীর অনেক বড় অপরাধী আর শয়তান ছিলো। আর আমি সব অপরাধীর পীর। সবচেয়ে বেশি ধোকা দিয়েছে সে তোমাকে। কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে।..........

'তোমার গোপন কথা আমার ভেতর গোপন থাকবে। তোমার স্বামী তোমাকে পবিত্র মনে করে। আমি ওকে একথাই বলবো যে, তুমি পবিত্র। কিন্তু আমার কাছে মিথ্যা বলবে না। তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করবো না। কিন্তু আমাকে উল্টো বুঝানোর চেষ্টা করলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার মুখের বর্ণের নানা ধরনের রূপান্তর ঘটলো। তারপর তার মাথা নুয়ে পড়লো। না, অভিযোগ ও তিরস্কারের ভয় দেখিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম না। তবে তার ভয়ও দূর করলাম না। যাতে সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে না পায়।

হ্যাঁ, এবার সে ভেঙ্গে পড়লো। চোখ ভরে পানি এলো। আমার কথার সুর ধীরে ধীরে মমতার সুরে রূপান্তর করতে লাগলাম।

আমার শুধু একটি কথা শুনুন– কান্নাভারী গলায় মিনতি করলো।

'শুধু একটা নয়, তোমার সব কথা শুনবো। তুমি তো আসামী নয়। তোমার সামান্য অপরাধ থাকলেও আমি এর ওপর পর্দা চড়িয়ে দেবো।'

'হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমার সব কথা আমানত হিসেবে গোপন রাখবেন। আমি ধোকায় পড়ে গিয়েছিলাম। একটা ছিলো সন্তানের লোভ, আরেকটা ছিলো খাযানার প্রলোভন। আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো এ দু'টো'।

নকল পীরকে আমি সত্য পীর বলে মনে করলাম এবং আমাকে সে যে খেদমতের কথাই বললো, আমি বিনা বাক্যে করে দিলাম। হায় আমার স্বামী যদি এটা জানতে পারে আমাকে জীবিত রাখবে না। আর যদি আমার প্রতি দয়া করে তাহলে তালাক দিয়ে দেবে।'

'আমি ওয়াদা করেছি আগেই, সব আমার ভেতর গোপন থাকবে, বরং আমার মনে সব দাফন হয়ে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পীরকে ঘরেরই কেউ না কেউ পালাতে সাহায্য করেছে। সেটা কে হতে পারে?....... তোমাদের নওকর কেমন?'

'নওকরের এত সাহস নেই'– তাজ জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলো– 'আপনার কার প্রতি সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহ নয়, আমি নিশ্চিত, আসামীকে ফেরার করানো হয়েছে, ... 'তোমার ননদ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? পীরের সঙ্গে কি ওর সখ্যতা হয়েছিলো?'.....

'আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে মাথায় এটা রেখে নাও। এ ব্যাপারে আমি আরো অসংখ্য নারী পুরুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। আমি সব জেনে নেবো। তারপর আসামী পাকড়াও করা হবে। তখন কিন্তু সব স্বীকার করবে। আর তোমার কোন কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে বড় বেইযযতী হবে তোমার। এখনও সময় আছে, সত্য বলে দাও আমাকে'– অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি।

'আপনি যা চাইবেন আমি তা দেবো..... শুধু বলুন, যদি এটা জানা যায় তাহলে কি তাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন?' ভয় ও আশার মিশ্রিত সুর তার কণ্ঠে।

'না, যে ফেরার করেছে সে নিজের ঘর থেকে ফেরার করিয়েছে। তাই তার জন্য এটা অপরাধ নয়। কারণ এ ঘর বা বাড়ি থানার জেলখানা নয়। জেলখানা থেকে পালানো এবং পালাতে সাহায্য করা অনেক বড় অপরাধ।......

'তবে আসামীকে গ্রেফতার করার পর যদি সে জানিয়ে দেয় এ বাড়ির অমুকে তাকে পালাতে সাহায্য করেছে তাহলে তাকে এ সন্দেহে গ্রেফতার করা

হবে যে, পীরের ধোকাবাজি ও বদমায়েশী কাজে এও জড়িত। তোমার কথায় মনে হচ্ছে, তুমি কিছু একটা বলতে চাও। কিন্তু ভয় পাচ্ছো, তোমার ভেতর যে কথাটা গুমরে মরছে সেটা খোলাসা করো। আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই নেবো না।'

তখন তো আমি ভরা যৌবনের যুবক। লোকে আমাকে সুপুরুষও বলতো। তাজ আমার কথা শুনে আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালো আমি এর অর্থ না বোঝার মতো বোকা ছিলাম না।

আমার যৌবনকে সে আমার দূর্বলতা মনে করতে লাগলো, এমনকি আমার একটি হাত সে গাঢ়ভাবে চেপে ধরলো। আমি হাত সরালাম না। তার চোখ আমার অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। বুঝলাম, বেচারী বড় অসহায় বোধ করছে। আমারও একটি হাত তখন তার হাতের ওপর মৃদুভাবে রাখলাম।

'তাজ!' তার চোখে চোখ রেখে বললাম– 'আমি নকল পীরও নয়, ধোকাবাজও নয়। আমি সম্মানিত এক ব্যক্তি। সম্মান প্রাপ্যকে আমি সম্মান করি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখবো। তোমার মনের কথা নিঃসন্দেহে বলে যাও।'

'তাকে আমিই ঘরে থেকে বের করেছি'– তাজ খুব চাপা গলায় বললো।

'কেন?'

'আপনার হাতে আমার ইযযত'– সে বললো– 'আপনি তো জানেন, তার সঙ্গে আমি রাত কাটিয়েছি। এও জানেন, কিসের লোভে কিসের আশায় আমি আমার ইযযত দিয়েছি' ....

তারপর যখন তাকে এক গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে এলো, তখন আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তাকে মারপিট করে পুলিশের কাছে হাওলা করা হবে তখন তো সে বলবে, তোমরা কোথাকার এত ভদ্রলোক হলে? তোমাদের ঘরের অমুক মেয়ে রাতে আমার কাছে আসতো। আসলে আমার স্বামী আদালতকে ভীষণ ভয় পাই আমি।'

'তোমার স্বামী মান ইযযত আর ভদ্রলোকি তখন কোথায় গিয়েছিলো যখন তোমাকে সেই ভণ্ডপীরের কাছে এক বদ্ধ কামরায় পাঠিয়েছিলো?'

কিন্তু দোষ তো সব মেয়েদের মুখে মলে দেয়া হয়। আমার স্বামী না বললে আমি হয়তো এ কাজ করতাম না।'

'আমি তোমার স্বামীর মতো কাপুরুষ নই। তোমার ইযযত নিয়ে খেলতে দেবো না কাউকে'– গলাটা কিছুটা আবেগী হয়ে গেলো আমার।

'আমি সারা জীবন আপনার অনুগ্রহ শোধ করতে পারবো না– 'তাজ ধরা গলায় বললো– 'আমি আমার ইযযত বাঁচানোর জন্যই একাজ করেছি। ওরা তো

পীরকে ঐ কুঠরীতে বন্দী করে রাখলো। আমি মাঝ রাতে উঠলাম। আমার স্বামী গভীর ঘুমে অচেতন। আমার শাশুড়ী ও ননদ অন্য আরেক কামরায় ঘুমিয়ে। আমার জানা ছিলো, অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছি আমি। ধরা পড়লে চৌধুরী আমাকে কতল করে দেবে। কিন্তু আমার ওপর কি যেন ভর করেছিলো। চোরের মতো খালি পায়ে প্রথমে দেউরীর প্রধান দরজার কাছে গেলোম এবং দেউরীর শিকল আলগা করে দিলাম.........

'তারপর আমি ঐ কামরার দরজা খুললাম যার সঙ্গে কুঠুরী আছে। কুঠুরীর বাইরে কোন দরজা নেই। বড় কামরা ও কুঠুরীর মাঝখানে শুধু একটি দরজাই আছে। আমি ভেতরে গেলাম। ঘোর অন্ধকারে নিঃশব্দ পায়ে মাঝখানের দরজায় গিয়ে দরজার শিকল খুললাম। আমি ওকে আওয়াজ দিলাম। সে আমার কাছে ছুটে এলো। তাকে বললাম, দেউরীর দরজার শিকল খুলে এসেছি। কোন শব্দ না করে বেরিয়ে পড়ো.......

'সে কৃতজ্ঞতায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললো,- আমি বেঁচে থাকলে তোমার ঐই ঋণ আমি শোধ করবো।

আমি বললাম, তুমি শুধু এতটুকু করো আমার জন্য যে, কখনো ধরা পড়লে আমার নামে বদনাম দিয়ো না। তোমার মুখ থেকে যেন এ শব্দ বের না হয় যে, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে। সে বললো, সারা জীবন তোমাকে মনে রাখবো আমি। তোমার দুর্নাম হতে দেবো না আমি.......

'সে চলে গেলো। আমার কাছে মনে হলো, দম আটকে আমি মারা যাবো। ভয়ে আমার পা জমে গিয়েছিলো। আমি কুঠরীর সঙ্গের দরজা খুলে সে কামরার জানালাটি খুলে দিলাম। তারপর অন্য কামরায় গিয়ে দরজার শিকল তুলে দিলাম। তারপর বাইরে এসে বড় কামরার দরজাও লাগিয়ে দিলাম। এরপর কোন ক্রমে দেউরীর দরজা বন্ধ করে দিলাম। যখন আমি আমার খাটে ফিরে এলাম তখন দু' চোখ জুড়ে শান্তির ঘুম নেমে এলো। কিন্তু আমি কেঁদে ফেলাম......

'সকালে সর্বপ্রথম চৌধুরী বললো, কাফেরটা পালিয়ে গেছে। আমি দৌড়ে গেলাম। বললাম, কোন জায়গা দিয়ে পালিয়েছে। খাটের নিচে বা এদিক ওদিক দেখো। কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো। ওদিক থেকে ক্যাপ্টেন সাহেবও এসে গেলেন। তিনি যখন দেখলেন, জানালার পাট খোলা তখন ঘোষণা করলেন, এই জানালা খুলে পালিয়েছে।..........

'খোদা আমার স্বামী ও কাপ্তান সাহেবের চোখে এমন পর্দা ফেলে দিলেন যে, তার মনে এই খেয়ালই এলো না যে, ঐ দিকের দরজা সকালে খোলা ছিলো, না

বন্ধ ছিলো..... আমি স্বস্তি পেলাম যে, আমার সব গোপনীয়তা ঐ লোকের সঙ্গে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন আমার ইযযত আপনার হাতে'।

'চিন্তা করো না তাজ!'– অভয় দিলাম আমি।

'আপনি কি আমার একটি অনুরোধ রাখবেন? তাকে আপনি গ্রেপ্তার করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা তো তাকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। সে যদি ধরা পড়ে আমার দুর্নাম করে ছাড়বে।'

সে কত জনের দুর্নাম করবে? এ ধরনের পীর তাদের জাদুর ভেল্কি সেসব ঘরে চালায় যে ঘরে পয়সা আছে বা সুন্দরী মেয়ে আছে। জানি না এ পর্যন্ত কতজনকে সে নাপাক করেছে। তোমার সঙ্গে তো ওর শত্রুতা ছিলো না..... সে ধরা পড়লো কি পড়লো না– এটা তোমার ভাবনার বিষয় নয়। তবে আমি তোমার দুর্নাম হতে দেবো না'।

*** *** ***

আমার একটা সন্দেহ তো ঠিক হলো। পীরকে ফেরার করা হয়েছে। আমার মনে সন্দেহ আরেকটা জাগলো, তাজ হয়তো আগ থেকেই জানতো, আসামী নকল পীর। তার যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য সে এই নাটকের ব্যবস্থা করেছে। আমি এ সন্দেহটা উল্টে পাল্টে দেখলাম। কিন্তু এ সন্দেহের কোন সন্তোষজনক ভিত্তি না পেয়ে মন থেকে তা তাড়িয়ে দিলাম।

সেদিনও আমি গ্রামে কাটালাম। আরো যেসব ঘরে পীর হানা দিয়েছিলো তাদের কাহিনী শোনলাম। কাহিনী একেকটার চেয়ে একেকটা চমপ্রমদ। সেটা অন্য আরেক সময় বলবো।

রাতে থানায় চলে এলাম।

পরদিন চৌকিদার থেকে জানতে পারলাম, পীর সাত আটটি গ্রামে তার পীরগিরি খাটিয়েছে। প্রত্যেক গ্রামের তিন চার বাড়িতে হানা দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, এসব বাড়ি থেকে দু'একজন সদস্য ফৌজে যোগ দিয়েছে।

আমার এখন জানার ছিলো, এসব এলাকার গুণ্ডা বদমায়েশরা কি পীরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো কিনা। এ ধরনের কোন ইংগিত পাচ্ছিলাম না। অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠছিলো এই মামলা। এলাকার রেজিষ্টার্ড গুণ্ডা-সন্ত্রাসীদের থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবদ করলাম। কিন্তু জানা গেলো না কিছুই।

এসময় চৌকিদার এমন কয়েকজনকে ধরে নিয়ে এলো, যারা পীরের প্রতারণা সম্পর্কে এক একটি কাহিনী শুনিয়ে গেলো। আরো অনেকে প্রতারণার শিকার হয়েছে ঠিক; কিন্তু লজ্জার কারণে তারা থানায় আসছে না।

এসব শুনতে শুনতে বিরক্তি এসে গেলো আমার। চৌকিদারকে বলে দিলাম, প্রতারণার শিকার হয়েছে এ ধরনের কোন বেকুবকে আর থানায় আনবে না। কেউ পীরের কোন খোঁজ দিতে পারলে তাকে নিয়ে এসো।

তখনকার পুলিশি গোয়েন্দা মাধ্যম এত তৎপর ছিলো যে, মাটির নিচের ভেদও গোয়েন্দা চোখে পর্যবেক্ষণ করতো। আর তখন আজকের মতো অপরাধমূলক কাজ এত বেশি সংঘটিত হতো না। এ কারণে গুপ্তচরা বৃত্তির কাজ শান্ত মাথায় করা যেতো। তাছাড়া হুকুমত ছিলে ইংরেজদের। ইংরেজরা পুলিশদের দায়িত্বে অবহেলা সহ্য করতে পারতো না।

তারপরও আসামী ও তার সঙ্গীদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না। আমার মনে হলো আসামী অনেক দূরের কোন এলাকার। আমার কাছে শুধু একটাই আলামত আছে, আসামীর এক চোখ নষ্ট। সে তার বেশ-ভূষা যতই পরিবর্তন করুক, নষ্ট চোখ বদলাতে পারবে না। ঠিক করলাম, এই কেসকে 'লাপাত্তা' রিপোর্ট করে খতম করে দেবো।

ক্যাপ্টেনের ছুটি শেষ হওয়ায় একদিন আগে তিনি থানায় এলেন। এর আগে আরো দু'বার এসে জানতে চেয়েছিলেন, আসামীর খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা। কিন্তু এবার এলো জবাবদিহি তলব করতে।

'এখনো কেন আসামীকে খুঁজে পাওয়া গেলো না?' ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন।

'এ ধরনের আসামীদের খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ নয়'– সৌজন্যতা দেখিয়ে বললাম।

'তাহলে আপনারা বেতন নেন কি দিয়ে? খোঁজ পাওয়া সহজ নয় কেন'?– ফৌজি দাপট দেখিয়ে বললেন কাপ্তান।

'এজন্য সহজ নয় যে, এ ধরনের আসামীকে আপনারা নিজ ঘরে রেখে খোদাকে ভুলে তাদের ইবাদত করেন'– শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বললাম– 'তাদেরকে খুশি করার জন্য নিজেদের মা বোনদের তাদের কাছে বসিয়ে রাখেন। তারপর লজ্জার মুখে পুলিশের কাছে আসল কথা এড়িয়ে যান। আপনি কি আপনার ভাইয়ের ঘরে খোঁজ নিয়েছেন, ঐ পীরকে কে ঘর থেকে ফেরার করেছে?'

তার ফৌজি দাপট– দম্ভ এক নিমিষেই উড়ে গেলো। তারপরও যখন তার ভাঙ্গা অহংকার নিয়ে আবার ফুসে উঠতে চাইলো আমি আরেকটি অস্ত্র ব্যবহার করলাম।

'আপনারা সবাই এই অপরাধীদের সঙ্গে ছিলেন'– আমি বললাম– 'হিন্দু মালাউনদের মতো যাকেই দেখেন মনে করেন তার কাছে বুঝি গায়েবি শক্তি আছে। তাকে নবীর মতো মানতে শুরু করেন।'

কাপ্তানের ঘাড় বাকা করে দিয়েছি ঠিক। কিন্তু এ কেসকে 'লাপাত্তা' হিসেবে মুলতবি করার জন্যও মজবুত ও উপযুক্ত কারণ হাজির করতে হবে। এটা আমার জন্য কঠিন কাজ ছিলো।

*** *** ***

এক মাস হয়ে গেলো। থানায় প্রতিদিন আরো কত মামলা আসে। ধীরে ধীরে পীরের বিষয়ে আমার আগ্রহ কমে গেলো।

একটা ব্যাপারে আমি খুব বিস্মিত হলাম যে, বড় বড় ডাকাত সন্ত্রাসীরা যেভাবে পরস্পরে বিভিন্ন এলাকা বন্টন করে নেয়, তেমনিভাবে পীরদের হালকা বা গ্রুপও বিভিন্ন গ্রামে শহরে ভাগ ভাগ হয়ে যদি কায়েম করতো।

নিজের এলাকাকে পীরেরা বলতো 'ওলায়েত'। এক পীর আরেক পীরের ওলায়েতে বা অধীনে যেতো না।

আমি হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম, এক ভণ্ড পীর যখন কোন এলাকায় এভাবে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ায় অন্য পীরেরা তার বিরুদ্ধে কিছুই বলে না।

আমাকে জাননো হয়েছিলো, আসামী যে গ্রামে গিয়েছিলো সে গ্রামের কাছে বড় কোন পীর নেই। তবে ছোট ছোট শাহ্রা আছে।

দশ বার দিন পর আমার এলাকার এক গ্রামে একটি পারিবারিক লড়াই– ঝগড়া হলো। দু'জন খুব বেশি যখমী ছিলো। আর তিন চারজন মামুলি যখমী ছিলো। উভয় পক্ষই নিকটাত্মীয়। দু'পক্ষই থানায় এসে মামলা করলো।

এসব ক্ষেত্রে থানাদাররা উভয় পক্ষের মধ্যে 'রাজিনামা' করে দেয়। এদেরকেও সেভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না। পরস্পরের বিরুদ্ধে এরা মামলা করবেই।

আমি যখমীদেরকে হাসপাতাল পাঠিয়ে দিলাম। সেখান থেকে ডাক্তারি রিপোর্টও তলব করলাম।

এরা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর আবার ওদেরকে বোঝালাম। তাদের ক্রোধ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। তারা আগের মতেই অটল রইলো। আমি তাদেরকে বললাম, একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইলে ঘরের মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় থাকতে হবে।

ঝগড়া ছিলো পারিবারিক। এক মেয়ের বাচ্চা হচ্ছে না বলে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাকে সব সময় যন্ত্রণা দিতো। মেয়ে তার ভাইকে সব বলে দেয়। ভাই বোনের স্বামীর ওপর চড়াও হয়। এভাবে উভয় পক্ষ লাঠি বল্লম নিয়ে হামলে পড়ে নিজেদের ওপরেই।

তাদেরকে জানিয়ে দিলাম, যে মেয়েকে নিয়ে ঝগড়া সে মেয়ে, তার মা ও শাশুড়ীকে থানায় হাজির করতে হবে। তাদেরকে জেরা করতে হবে।

এ ধরনের মামলা আমাদের জন্য কোন মামলাই নয়। আমাদের এলাকায় এসব কেসের হিড়িক বলা যায়।

ভোজন রসিক থানাদাররা এসব কেস পেলে খুশিই হয়। কারণ উভয় পক্ষই খায় খাতিরও করে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে। কিন্তু আমি এ বিষয়টা মামলার রূপ দিতে চাইনি। মেয়েদের থানায় ডাকাও একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

কিন্তু আমার জানার ছিলো না, এ কেস আমার আরেক অতি গুরুত্বপূর্ণ কেসের জটবদ্ধতা খুলে দেবে।

সন্ধ্যার দিকে মেয়েদেরকে থানায় আনা হলো। ইচ্ছে করেই ওদেরকে অনেক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। যাতে থানায় মামলা করার ঝামেলা বুঝতে পারে।

রাত আটটার দিকে প্রথমেই ডাকলাম ঐ মেয়েকে, যাকে নিয়ে এই ঝগড়ার সূত্রপাত। মেয়ের নাম পারভীন। অতি সুন্দরী না হলেও দৈহিক গঠন তার চমৎকার।

'এই লড়াইয়ের কারণ কি পারভীন! আমি অলস গলায় জিজ্ঞেস করলাম– 'তোমার শ্বশুর এতই যন্ত্রণা দেয় তোমাকে যে, রক্ত ঝরার ঘটনা ঘটে গেলো?'

'না জনাব! পারভীন বললো– 'শ্বশুর নয়, শাশুড়ী, পুত্রবধূকে অযথাই বিরক্ত করে। আমার সতের বছরের সময় বিয়ে হয়েছে। পাঁচ বছর হয়ে গেলো সন্তানের মুখ দেখিনি এখনো।'

'স্বামীর কোন রোগ টোগ?'

'না না। এটা ভাগ্যের দোষ। স্বামীর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। সবদিক থেকেই আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। এক বছল ধরে পীর ফকিরদের কাছে আমার মা শাশুড়িরা দৌড়ঝাপ করছে। আমাকে মাজার ও কবরস্থানের মাটি খাওয়াচ্ছে.....

'আমাদের গ্রামের কাছে এক 'শাহ' থাকেন। প্রথম তো ঐ শাহ মামুলি কিছু ঝাড়ফুঁক করতো। সাপ বিচ্ছুতে কাটলে চিকিৎসা করতেন। রোগ ব্যথায় দম করতেন, তাবিজ দিতেন। কয়েক মাসের মধ্যে তার নাম ছড়িয়ে পড়লো। তখনই

তার কব্জায় জিন এসে গেলো। তারপর এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, তার দম ও তাবিজে ত্রিশোর্ধ সন্তানহীন মেয়েরাও সন্তান লাভ করে............

'ঐ শাহকে প্রথম দেখাতেই আমার ভালো লাগেনি। কারণ জানি না। তিন মাস আগে আমার শাশুড়ি শাহের কাছে নিয়ে গেলো আমাকে। তাকে এক টাকা নজরানা দিয়ে বললো এর বাচ্চা হয় না।

শাহ দু'হাতে আমার চেহারা ঝাপটে ধরে তার মুখের কাছে নিয়ে গেলেন। তার মুখ থেকে এমন পঁচা দুর্গন্ধ এলো যে, আমার মাথা ঘুরে উঠলো.......

'সেদিন শাহ-এর চেয়ে বেশি আর কিছুই করলেন না। একটি তাবিজ দিয়ে বললেন, পানিতে মিলিয়ে খাবে। আর দুদিন পর আসবে। .....

তিন দিন পর শাশুড়ি আমাকে শাহের কাছে নিয়ে গেলো। আশ্চর্য, প্রথম দেখায় শাহকে যেমন খারাপ লেগেছিলো আজ ভালো লাগতে শুরু করলো। সন্তানের তীব্র বাসনা তো আমার ছিলো। এজন্য শাহের তাবিজ স্বপ্ন জাগিয়ে দিলো যে, আল্লাহ এর বরকতে আমাকে সন্তান দেবে........

'এবার শাহ আমার চেহারা ধরে আমার চোখে ফুক দিয়ে বললেন, এই মেয়ের ওপর এক ছায়া ঘুরছে। এবার দুটি তাবিজ দিলেন, একটা গলায় ঝুলানোর জন্য আরেকটা পান করার জন্য।'

*** *** ***

এত কাঁচা বয়সেও পারভীনের কথায় দারুন আস্থা ছিলো। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলে, মনে অসত্য, অপবিত্র কোন প্রবণতা না থাকলে, নির্মল আর পবিত্রতায় সজীবতা থাকলে আস্থা ও দৃঢ়তা জেগে উঠে এমনিই।

পারভীনের মধ্যেও দৃঢ়তার এই উচ্চারণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সে কথা বলছিলো অসংকোচে। তার বর্ণনা ছিলো দীর্ঘ। পুলিশ অফিসারের এত দীর্ঘ বয়ান শোনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি আগ্রহ নিয়ে শুনেছি তার কথা। যদিও এখানে এত লম্বা কথার প্রয়োজন নেই।

ওর স্বামী শাহকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মানতো। ওকে সবসময় শাহের কাছে যাওয়ার জন্য তাগিদ করতে থাকে। প্রথমে প্রথমে শাহের কাছে পারভীনকে নিয়ে যেতো শাশুড়ি। কিন্তু শাহের বলার পর পারভীন একাই যেতো। শাহ তার ওপর নানান আমল করতো।

এক মাসেরও অধিক হয়ে গেলো এভাবে। এমনিতেই শাহ হাসিখুশি মানুষ ছিলো। পারভীনের সঙ্গেও তার সম্পর্ক সহজ হয়ে গেলো। একদিন পারভীন শাহকে জিজ্ঞেস করলো,

তার আশা কবে পূরণ হবে?

'আমি তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি'– শাহ্ উত্তরে বললো– 'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। এজন্য তোমাকে আমি ধোকার মধ্যে রাখতে চাই না। এমন কোন পীর নেই, যে ঝারফুক আর তাবিজ দিয়ে সন্তান দিতে পারে। এমন খোদায়ী কারবার কারোই নেই।

'তোমার স্বামী তোমাকে দৈহিক আনন্দ দিতে পারে ঠিক, কিন্তু বাচ্চা দিতে পারবে না। আর বাচ্চা না হলে তোমার শাশুড়ি তোমাকে তালাক দেয়াবে। সন্তান না হওয়ার অপরাধ মেয়েদেরই হয়ে থাকে........

'পুরুষ কখনো মানতে চাইবে না তার মধ্যে কোন দোষ আছে। আর তোমাকে তালাক দিলে কেউ বিয়েও করবে না তোমাকে। বয়স দেখো তোমার। সেই কচি যৌবনও তো নেই তোমার।'

'শাহজী! পারভীন বললো– 'আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। অথচ আপনি আমার পীর ও উস্তাদ। বিশেষ কিছু কি বলতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ পারভীন! শাহ্ বললো– কিছুই বলতে চাই। 'সেটা হলো, আমি তোমাকে সন্তান দেবো। সে সন্তান হবে আমার। তোমার স্বামী একে নিজের সন্তান মনে করবে।'

পারভীনের হৃদয়টা ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কাটা হয়ে গেলো। সব স্বপ্ন রক্তাক্ত হয়ে গেলো। শাহের প্রতি ঘৃণায় ভরে উঠলো তার মন।

'আমার স্বামীর আমানতের খেয়ানত করতে পারবো না কখনো'– পারভীন ঘৃণায় উছলে উঠা কণ্ঠে বললো।

'যে মেয়েরা বলে, অমুক পীরের তাবিজ তাকে বাচ্চা দিয়েছে মনে রেখো, সেটা পীরের ঔরষের বাচ্চা! শাহ্ বললো।

'বিষ খেয়ে মরে যাবো আমি তবুও আমার দেহ নাপাক হতে দিবো না।'

'আমার কথা না মানলে তোমার স্বামী ও শাশুড়িকে বলবো, কোন গায়েবী পীরের বদ দুআ আছে এই মেয়ের ওপর। এজন্য পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

পারভীনের আত্মসম্মান বোধ জেগে উঠলো। সে ঘরে ফিরে এলো। এরপর শাহের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলো।

তার স্বামী ও শাশুড়ি নিয়মিতই আসা যাওয়া করতো শাহের কাছে। পারভীনকে যাওয়ার জন্য দু'জন চাপও দিতো। কিন্তু পারভীন পীরের আসল রূপ এ কারণে প্রকাশ করতে চাইতো না যে, তারা কেউ এ কথা বিশ্বাস করবে না। সে এমনিই মুখ বুজে চুপ করে রইলো।

এর ফলে তারা নানান অপবাদ কুৎসা রটাতে লাগলো তার নামে। তালাক দেয়ার হুমকিও দিলো। স্বামীও জোর জবস্তি শুরু করে দিলো।

একদিন পারভীন তার স্বামীকে পীরের আসল রূপের কথা জানিয়ে দিলো। প্রতি উত্তরে পারভীন স্বামীর হাতের প্রচণ্ড একটি চড় খেলো।

বললো, শাহজী ঠিকই বলেন, এই মেয়ের ওপর বদ দুআ আছে। স্বামী হুকুম দিলো আজই শাহের কাছে যেতে হবে।

পারভীনের ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। সে পাগলের মতো হয়ে গলো। সিদ্ধান্ত নিলো, আজ রাতেই শাহের কাছে গিয়ে বলবে, তার পেটে বাচ্চা জন্ম দিতে।

স্বামীকে জানলো, সে রাতে শাহের কাছে যাবে। স্বামী জিজ্ঞেস করলো, রাতে কেন? দিনে যাও।

পারভীন বললো, এখন আমার ওপর যে আমল করবে সেটা রাতেই করতে হবে। দিনে কোন কাজ করবে না।

স্বামী সানন্দে তাকে অনুমতি দিয়ে দিলো।

*** *** ***

'শাহের বাড়ি বা আস্তানা বেশি দূরে ছিলো না'– পারভীন আমাকে শোনাচ্ছিলো– কাঁদতে কাঁদতে আমি যাচ্ছিলাম। না, তালাকের ভয়ে শাহের খাহেশ পূরণ করতে নয়, আমার মনের প্রতিশোধের আগুন নেভাতে। আমার স্বামী যদি তার স্ত্রীর সতীত্বের পরিবর্তে সন্তান চায় আমি সন্তান দেবো।

যদি নিজ ইচ্ছায় এই পাপ করতে যেতাম তাহলে এমন কারো কাছে যেতাম যাকে আমার পছন্দ হবে। শাহ বদকার এক লোক– এটা তো আমার স্বামী মানতেই চাচ্ছিলো না........

'তাকে আমি বলেছিলাম, আমরা একে অপরকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। সন্তান হয় না, এতো আমার বা তোমার কোন দোষ নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছা। আমি স্বামীকে বলেছিলাম, যে পুরুষ বাপ হতে না পারে তার মধ্যে পৌরুষের সম্মান থাকে না......

'শাহের আস্তানার কাছে গিয়ে আমার পা আটকে গেলো। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম আমি। অশ্রুতে ভরে গেলো আমার চোখ দুটি। ফরিয়াদ বের হয়ে এলো আমার মুখ থেকে–

'হে নীল আকাশের মালিক! আমার ভাগ্যে তুমি এ কি লিখে রেখেলে? তোমার গুনাহগার বান্দি কি করছে? ক্ষমা করো গো খোদা! জানো, আমি কেমন বাধ্য হয়ে এই পাপের জগতে যাচ্ছি...

বলতে বলতে শাহের দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিলো, আস্তে আস্তে দু'বার টোকা দিলাম। দরজা খুলে গেলো।

'কে? এসময় কি নিতে এসেছো?'- শাহের রাগত স্বর।

'শাহজী! আমি এসেছি- আমি বললাম।

'আমি জানতাম তুমি অবশ্যই আসবে'- আমাকে দেখে শাহ্ বেশ খুশি হলো।

'সে আমার হাত ধরে ভেতরে গেলো এবং উচু আওয়াজে বললো, আমারই এক বান্দা। ভেতরে একটি খোলা কামরা থেকে আগুন বাতির আলো আসছিলো। শাহ্ আমাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে বললো, তোমাকে একটি কামরায় এখন বসাবো। সেখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে' ......

'শাহ্ বাইরের দরজার শিকল চড়াচ্ছিলো, এই ফাঁকে আমি সেই আলোকিত কামরার দিকে তাকালাম। এক লোক মাটিতে বসা ছিলো। আর এক বৃদ্ধ নাপিত আমাদের গ্রামের- তার চুল কাটছিলো। প্রথমে লোকটিকে মহিলা ভেবেছিলাম। কারণ তার চুল মহিলাদের মতো লম্বা। আবার লম্বা দাঁড়িও আছে.....

'শাহ্ আমাকে ভেতরের আরেকটি কামরায় নিয়ে গেলো। ম্যাচ দিয়ে আগুন বাতি জ্বালালো। কামরায় একটি খাট সাজানো ছিলো। আমাকে খাটে বসিয়ে বললো, নির্ভয়ে বসে থাকো। আমি আসছি। কামরা থেকে এই বলে বেরিয়ে গেলো।

'একলা ঘরে মনে হলো, আমার নিঃশ্বাস এমনভাবে চেপে আসছে যেন আমার স্বামী কোন অন্ধকার কূপে আমাকে ফেলে দিয়েছে। একবার মনে হলো, শাহ্ আমাকে আমাদের বাড়ি থেকে উঠিয়ে এনেছে.......

'আমি আরেকবার আল্লাহকে স্মরণ করলাম। কাঁদতে থাকলাম। তারপর হঠাৎ আমার আত্মার ভেতর আলো জ্বলে উঠলো। কে যেন ধাক্কিয়ে আমাকে খাট থেকে নামিয়ে দিলো। আমি বাইরে বের হয়ে এলাম। বাইরের কামরাটি তখন বন্ধ। আমি দেউরীর দরজার শিখল খুলছিলাম।

এ সময় ঐ কামরাটি খুলে গেলো। শাহ্ বেরিয়ে এলো। আমাকে দেখে হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাও? আমি হালকা সুরে বললাম, এই

একটু আসছি, দরজা খোলা রাখবেন। শাহ্ আমাকে বিশ্বাস করে কাঁধ ঝাকালো। আমি পথে নেমে পড়লাম।'

পারভীনের ভেতর যেমন খোদাতাআলা আলো জালিয়ে দিয়েছেন, আমার ভেতরও পারভীন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার মনোযোগ পারভীনের গল্পের এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেলো।

'পারভীন! আমি জিজ্ঞেস করলাম তখনই– 'বলো তো, তুমি যখন দেউরী থেকে বের হচ্ছিলে এবং শাহ্ দরজা খুলেছিলো তখন কি ঐ লোকটিকে দেখেছিলে, নাপিত যার চুল কাটছিলো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ পারভীন মাথা ঝাঁকিয়ে বললো– 'জানিনা সে কে? নাপিত তখন তার চুল কেটে আপনার চুলের সমান করে দিয়েছে। নাপিত তার দাড়ি কামাচ্ছিলো। এত দিনের দাড়ি পরিষ্কার করে ফেলছিলো।

'তার এক চোখ কি কোন কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিলো?'

'এত সুক্ষ্মভাবে দেখতে পারিনি। কেন সে কি বিশেষ কেউ ছিলো?'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কতদিন আগের ঘটনা এটা? সে হিসাব করে বললো, এক মাসের চেয়ে তিন চারদিন বেশি হয়ে গেছে।

আমি হিসাব করে দেখলাম, ঐ ভণ্ডপীর ক্যাপ্টেনের ভাই আদালতের বাড়ি থেকে তখনই পালিয়েছিলো।

এরপর আর পারভীনের কথার প্রতি মনোযোগ রাখতে পারলাম না। শুধু এতটুকু মনে আছে, পরে তার স্বামী ও শাশুড়ীকে শাহ নালিশ করলো এবং তারা পারভীনের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিলো। বাধ্য হয়ে পারভীন শাহের কথা, তার স্বামী ও শাশুড়ির শাহের প্রতি অন্ধ ভক্তির কথা জানিয়ে দিলো।

পারভীনের ভাই তখনই তার ভগ্নিপতিকে ধরলো। কথায় কথায় তাকে কাপুরুষও বলে ফেললো। আর যায় কোথায়? হাতাহাতি হয়ে গেলো এবং তা বড় ধরনের মারামারি রূপ নিলো।

যা হোক তাদের মধ্যে আমি 'রাজীনামা' করিয়ে দিলাম। পারভীনের স্বামী অন্যদের চেয়ে বেশি যখমী হয়েছিলো। তাকে ডেকে কিছু কটু কথা বলে লজ্জা দিলাম। আর বললাম ঐ ভণ্ড শাহের আসল রূপ তোমাদেরকে দেখিয়ে ছাড়বো।

তার পরদিন আসার কথা বলে সবাইকে বিদায় করে দিলাম।

*** *** ***

রাত তখন সাড়ে দশটা। আমার মাথায় ঘুরছিলো একটা কথাই, ঐ প্রতারক পীরের চুলও মেয়েদের মতো কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এবং দীর্ঘ দাড়ি ছিলো। শাহের এক কামরায় রাতের বেলা আগুন বাতি জ্বালিয়ে চুল দাড়ি কাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো না। আর দিনটাও ছিলো পীরের পালানোর দিন।

ঐ বৃদ্ধ নাপিতের নাম জেনে নিয়েছিলাম পারভীনের কাছ থেকে। হেড কনস্টেবলসহ আরো চারজন কনস্টেবল নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। রওয়ানা দিলাম শাহের গ্রামের দিকে। এক মাসের চেয়েও অধিক সময় কেটে গেছে। তাকে যে পাওয়া যাবে না জানতাম আমি। তাছাড়া তাকে ধরার যে আলামত (একটি চোখ নষ্ট) সেটাও পারভীন দেখেনি। তারপরও আমার অন্তর থেকে আওয়াজ উঠছিলো, এই-ই লোকই সেই প্রতারক পীর।

শাহের গ্রাম বেশি দূরে নয়। সেখানে পৌঁছলে রাত জাগা কুকুর আমাদেরকে স্বাগত জানালো। আমি চৌকিদারকে ডেকে নাপিতের নাম বলে বললাম, তাকে জাগিয়ে নিয়ে এসো। আমাদের পেছন পেছন ততক্ষণে মারপিট ওয়ালা মামলাকারী দলও গ্রামে পৌঁছলো।

এক বৃদ্ধ নাপিত চৌকিদারের সঙ্গে দৌড়ে এসে হাত জোর সালাম করলো আমাকে। তাকে বললাম, এক মাস আগে যে এক রাতে তুমি শাহের আস্তানায় এক লোকের চুল দাড়ি কামিয়ে ছিলে তার নাম কি?'

'না হুজুর! আমি তো কারো চুল.......

আমার আচমকা এক চড় বুড়োর মিথ্যে কথা কেড়ে নিলো। সে একদিকে গড়িয়ে পড়লো। চৌকিদারও আমাকে খুশি করার জন্য কয়েকটি ঘা লগিয়ে বললো,

মিথ্যা কেন বলছিস অ্যাঁ?'

'ওকে উঠাও, আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দাও'– আম বললাম।

তাকে আমার সামনে দাঁড় করানো হলো।

'প্রথমে বল্ আমার সঙ্গে মিথ্যা বললি কেন? দেখ আমি এখন কিভাবে তোর হাড় গুড়ো করি।'

'হুজুর! নাপিত হাত জোড় করে কাঁদতে কাদতে বললো– 'শাহজি আমার মুরশিদ। আমি উনার বদ দুআকে ভয় পাই। আমাকে এক রুপিয়া দিয়া

বলেছিলেন কাউকে বলবে না যে, আমার বাড়িতে তুমি কারো চুল কেটেছিলে। তিনি আমার ঘর থেকে আমাকে ডেকে এনেছিলেন। আমার তো অস্বীকার করার শক্তি ছিলো না।'

নাপিতকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, ঐ লোকের দু'চোখই সুস্থ। পরনে তার ছিলো সাদা কাপড়।

'তুমি যখন তার চুল কাটছিলে তখন তার ও শাহের মধ্যে কি কথা হয়েছিলো?'

'বেশির ভাগ সময়ই তো সে চুপ ছিলো– বুড়ো জবাব দিলো, 'কথা বললেও এমন ইংগিতে বলেছিলো যে, আমি এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারিনি। শাহজি তাকে বলেছিলেন, ফজরের আযানের আগে বেরিয়ে পড়বে। সে লোক বলেছিলো, বিপদ কেটে গেছে। এখন আর কোন চিন্তা নেই।

'তার চুল ও দাড়ি কোথায় ফেলেছিলে?'

'আমি সেগুলো একটি কাপড়ে জমিয়ে রেখেছিলাম, শাহজি বললেন, কাপড়টি বেঁধে আমাকে দিয়ে দাও–

বুড়ো বললো– আমি চুল শুদ্ধ পুটলিটা তাঁকে দিয়ে দিলোম। শাহজি তখন আমার কাছ থেকে কসম নিলেন। আমি যেন কখনো একথা কাউকে না বলি।'

আমি আমার লোকজনসহ শাহ-এর আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। চৌকিদারকে বললাম, দরজা টোকা দাও। দরজায় টোকা দেয়ার পর শাহ নিজে দরজা খুলে দিলো। রাগে গজর গজর করতে লাগলো। কারণ, তাকে ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে।

চৌকিদার শাহকে হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে এলো। আমি তখন এগিয়ে গিয়ে সালাম দিয়ে শাহের সঙ্গে হাত মেলালাম। আমার হাত ধরে সে ভেতরে নিয়ে গেলো আমাকে। ভেতরে গেলাম আমি একলাই।

'শাহজি! আমি বললাম মৃদু স্বরে– 'চেষ্টা করবেন আমার হাতে যেন আপনার বেইজ্জতি না হয়। প্রায় মাসাধিক আগে যে আপনার আস্তানায় এক লোকের চুল দাড়ি কাটানো হয়েছিলো সে কে ছিলো? সে এখন কোথায় আছে?'

শাহ আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন তার সঙ্গে আমি মশকরা করছি।

'তাড়াতাড়ি বলুন শাহজি'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না'– বিস্ময়ের ভাব তার কণ্ঠে– 'আমার বাড়িতে কারোই চুল কাটানো হয়নি।'

'ভেবে চিন্তে জবাব দেবেন শাহজি!'– শান্ত সুরে বললাম– 'এই মাঝ রাতে আপনার এখানে এমনি আসিনি। যে চুল কেটেছিলো তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আর যে চুল কাটতে দেখেছে সেও আমার হাতে'........

'আমি আপনাকে বলেছি আমার হাতে আপনার বেইজ্জতি করাবেন না। গার্ড নিয়ে এসেছি আমি। পুরো বাড়ি তল্লাশি হবে। আর জনাবকে হাত কড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

তারপরও সে আমাকে বেকুব বানানোর চেষ্টা করলো।

'তার নাম ঠিকানা বলে দাও– আমার সুর ভয়ংকর করে বললাম– আর তার চুল দাড়ি যেখানে চাপা দিয়ে রেখেছিলে নিজেই তা বের করে দাও......... এখনি....... আর সময় দেবো না আমি।'

তার মাথা দুলে উঠলো।

'কোন সুযোগ কি দেয়া যায় না?' সে মাথা ওভাবে রেখেই জিজ্ঞেস করলো।

'যেটা জানতে চেয়েছি আগে সেটা বলে নাও– আমি বললাম আগের সুরে– 'সে কে?'

'আমার মান সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখবেন'– মিনতি করলো শাহ– 'আমি সবকিছু বলে দেবো এবং আপনার খেদমতও করবো। আল্লাহকে বহুত ইয়াদ করেছি।'

আরো কিছু বক বক করে সে এক গ্রামের কথা বললো, এখান থেকে আট নয় মাইল দূরে। তার বাড়ি সেখানেই।

'তাকে ভণ্ড পীর কি তুমিই বানিয়েছো?'

শাহ মাথা দোলালো। তার নাম বললো, 'সারমুদ'।

*** *** ***

তার অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক বর্ণনা শোনার আগে বললাম, তার বাড়ির ভেতর সার্চ করবো আমি। সে মিনতি করলো যে, তার জবানবন্দি নিয়েই যেন আমি তাকে ছেড়ে দিই। এতে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো।

আমার লোকদের ডেকে বললাম, বাড়ি তল্লাশি শুরু করে দাও। শাহ হাতজোড় করে আমার সামনে এসে দাড়ালো, তল্লাশি চালাবেন না। আমি তাকে বললাম, সারমুদের চুল দাড়ি দিয়ে দাও এবং তার বাম চোখে যে কাপড় বাঁধতো সেটা যদি নকল হয় সেটা এখন কার কাছে? তোমার কাছে হলে আমাকে দিয়ে দাও।

আমার জানা ছিলো, এই শাহ্ অভিজ্ঞ এক ফ্রড। ঐ নফল পীরও আনাড়ি নয়। তাই এত লম্বা চুল ও দাঁড়ির স্তুপ কোন ডাস্টবিনে ফেলে দেয়ার মতো বেকুব নয় এরা।

শাহ এক কামরায় নিয়ে গেলো আমাকে। একটা বাক্স থেকে সবুজ এক টুকরো কাপড় বের করলো। সারমুদ এটা তার বাম চোখে বাঁধতো।

এ সময় হেড কনস্টেবল এসে বললো, এক কামরা থেকে দুই লোক গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা পালানোর পায়তারা করছিলো।

শাহ্ জানালো, এরা তার চ্যলা। শাহ্ আমাকে বাইরে নিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বললো, এখানে দাবানো হয়েছিলো চুল দাঁড়ি। তাকে মাটি খুড়ে বের করতে বললাম।

কয়েকজন সাক্ষীর সামনে সে চুল ও দাড়ি বের করলো। তারপর সারা বাড়ি তল্লাশি চালালাম। দুটি খঞ্জর ও একটা সুটকেসের ভেতর থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেলো। আজকের হিসেবে কয়েক লাখ টাকারও বেশি। শাহ্ এবং তার দুই চ্যলা ও বুড়ো নাপিতসহ থানায় ফিরে এলাম।

থানায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় শেষ প্রহরে গিয়ে পৌঁছলো।

শাস্তির দাগা দেয়ার লোহার শিক উত্তপ্ত ছিলো তখন। এজন্য কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয়াটা সমীচিন মনে করলাম। প্রথমে দুই চ্যালাকে মুখোমুখি করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, শাহের ঘরে কি করছিলে?

'হুজুর! সে বললো– 'জানি আপনি শাহজি ও আমাদেরকে কেন পাকড়াও করেছেন। কিন্তু আমি এ অপরাধে জড়িত ছিলাম না। আমার সঙ্গের ঐ লোকটা সারমুদের সঙ্গে গিয়েছিলো। সে ওখান থেকে পালিয়ে আবার শাহের কাছে ফিরে আসে। সারমুদের সঙ্গে যে আরেকজন ছিলো, সে সারমুদের এলাকাতেই থাকে।'

তাকে যা জিজ্ঞেস করলাম সে সব বলে দিলো।

আরেক চ্যালাকে ডেকে বললাম, মিথ্যা বলার মতো বেকুবি করবে না। যা জিজ্ঞেস করবো, সঠিক উত্তর দিবে।

সেও সিয়ানা লোক। স্বীকার করলো, সে সারমুদের সঙ্গে ছিলো। আমি বললাম, তাকে রাজসাক্ষী বানানো হবে। সব বলে দিলে এবং আসামীরা ধরা পড়লে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করবো। সে জবানবন্দি দিয়ে দিলো।

তারপর শাহকে ডাকলাম। সে ঘুষ দিতে চাইলো। তবে জবানবন্দিও দিলো। সারমুদ ও তার দুই সঙ্গীর অপরজনের ঠিকানা বলে দিলো। তখনই

আইএসআইকে তিনজন কনস্টেবল দিয়ে তাদের দু'জনকে গ্রেপ্তারের জন্য শহরে পাঠিয়ে দিলাম।

এরপর শাহ্ ও তার এক চ্যলা যে সারমুদের সঙ্গী ছিলো তাদেরকে বন্দি করে হাজতে বন্দি করে রাখলাম।

অন্য চ্যলাকে সন্দেহ্ ভাজনের তালিকায় রাখলাম। সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি। কিন্তু থানা থেকেও অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। তাই থানার কনস্টেবল ব্যারাকে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

*** *** ***

শহর থেকে নকল পীর সারমুদ ও তার অপর সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করতে তেমন বেগ পেতে হলো না। সেখানকার থানাদার (ওসি) আমার আই.আস.আই এর কাজ সহজ করে দিয়েছেন। তিনি থানার রেকর্ড কোট দেখেছেন। সামুদের নাম নেই কোথাও। তার সঙ্গীরা শহরের মন্দ লোকদের সঙ্গে চলাফেরা করলেও চুরি চামারি করার মতো বদমায়েশ ছিলো না।

সেখানকার থানা অফিসার সারমুদের পরিচিতি দু'জন লোককে ডেকে তার সম্পর্কে খুটি নাটি জেনে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন।

তারা জানালো, সারমুদের মাথায় কোন গণ্ডগোল থাকতে পারে। তার নিকটাত্মীয়রা শহরে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিন্তু সারমুদ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করে। বয়স একত্রিশ বত্রিশ। এখনো বিয়ে করেনি। ছ ফিটের ওপর লম্বা দেখতে দারুন সুদর্শন। অনেক অভিজাত ঘর থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু সম্মতি দেয়নি কোথাও। তবে চালচলনে দুর্নামও ছিলো কিছু।

তার বাবার বিশাল সম্পত্তির সেই একমাত্র ওয়ারিশ। মা বাবা মারা গেছে অনেক আগেই। শহরে বড় বড় তিনটি বাড়ি রেখে যায় তার বাবা। শহরের প্রান্তে শত বিঘা ধানি জমিও আছে তার। একটি বাড়ি তো অনেক বড়। হিন্দু জমিদাররা ভাড়া নিয়ে সেখানে বড়সড় এক স্কুল খুলেছে। তার যমিনের আয়ও বেশ ভালো।

কিন্তু সে অদ্ভুত সব কাজ করতো। কখনো আলগা দাড়ি ও শিখদের পাগড়ি লাগিয়ে শিখ পণ্ডিত সেজে শহরে ঘুরে বেড়াতো। কখনো চৌধুরী জমিদারদের মতো কলিদার জামা-সেলওয়ার ও পাগড়ি মাথায় দিয়ে কয়েক দিন শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতো।

আবার একবার জটধারী হিন্দু সন্যাসী সেজে বিভিন্ন জায়গার হিন্দুদের ঘর থেকে বেশ পয়সা কামিয়ে নেয়। সেগুলো দিয়ে বন্ধু বান্ধবদের কয়েক দিন মৌজ

করে। গলার সুর ছিলো তার অসাধারণ। যে কোন লোককে পাগল করে দেয়ার মতো। এছাড়া তার বিরুদ্ধে থানায় কোন রিপোর্ট নেই। কেউ তার বিরুদ্ধে কোন নালিশও জানায়নি কোন দিন।

আই.এস.আই. সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়ে আসামীকে আমার সামনে হাজির করলো।

আশ্চর্য। আসামীর মুখে মুচকি মুচকি হাসি। যেন আমাকে বিদ্রূপ করছে। তার চোখ দুটিও সুস্থ-উজ্জ্বল দৃষ্টি।

তার মৃদু হাসির প্রভাবেই– না অন্যকোন কারণে জানি না। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো–

'ওর হাত কড়া খুলে দাও......... আর তুমি বসো সারমুদ'।

তার হাতকড়া খুলে দেয়া হলো, আমার সামনের চেয়ারে সে সহজ হয়ে বসে পড়লো।

'এটা কেমন ড্রামা খেললে সমুদ?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনিই বলুন, এখনও কি ড্রামা রয়েছে'?– সে হাসিমুখে বললো।

ওর যেন এই অনুভূতিটুকুও নেই যে, তার এই নাটক খেলা কোন পরিণতিতে নিয়ে যাবে।

'নাটক আর ড্রামা খেলা তো ছিলো চমৎকার– আমি বললাম– 'আচ্ছা! এসব কি তুমি টাকা পয়সার লোভে করেছো না নারী শিকারের জন্য?'

'শিকার তো অনেক খেলেছি'– এমনভাবে বললো যেন সে আমার বন্ধু– 'পয়সার কোন লোভ নেই আমার। মারদান শাহ ও তার এক চ্যালাকে হাজতে দেখেছি আমি। তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন। যত টাকা পয়সা কামিয়েছি আমি সব দিয়ে দিয়েছে মারদান শাহকে'।

আসামী শাহের নাম মারদান খাঁ। মারদান শাহ্ বলে ডাকে তাকে তার চ্যালারা।

'সারমুদ! মনে হচ্ছে তুমি জানো না যে, জেল খানায় যাচ্ছো তুমি?'

'ফাঁসি তো আর দেবেন না। কাউকে আমি হত্যা করিনি। চুরি ডাকাতিও করিনি। কারো পকেটও কাটিনি। লোকেরা নিজেরা এসে পয়সা দিয়ে যায়'– কণ্ঠে তার নির্বিকার ভাব।

'আর যেসব মেয়েদের তুমি নষ্ট করেছো?'

'এমন একজন মেয়েকে আমার সামনে নিয়ে আসুন, যে নালিশ করবে তার ওপর আমি জোর খাটিয়েছি'– তার হাসি আরো বিস্তৃত এলো– 'আমি আপনাকে

অসন্তুষ্ট করবো না। যা জানতে চাইবেন সব বলে দেবো। এতো আপনার পেশাগত দায়িত্ব' ....

'আমি একজন মুসাফিরের মতো ছিলাম হুজুর! এই দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে বিদায় নিতে এসেছি। আমাকে শাস্তি দিয়ে যদি আপনি খুশী হন তাহলে শাস্তি দেন। আমি আপনার মন খুশি করে দেবো।'

আমার দীর্ঘ পুলিশি জীবনে এ ধরনের আসামী এই প্রথম এবং শেষ দেখলাম।

'তোমার নাকি মাথায় গণ্ডগোল আছে?– আমি বললাম– তুমি কি নিজেকে সুস্থ মনে করো?'

'এ ব্যপারে আপনার কি ধারণা?'

'আমি তোমাকে সুস্থ বুদ্ধিমানই মনে করি। তুমি যে দারুন সফলতায় মানুষকে ধোকা দিয়েছো। অসুস্থ মাথার কেউ এমনটি করতে পারতো না।'

আমি হয়রান হয়ে গেলাম, তার হাসি হঠাৎ করেই মুছে গেলো। উজ্জল মুখটি বিবর্ণ হয়ে গেলো। চোখ দুটো লাল হয়ে গেলো।

'আমি কাউকে ধোকা দেয়নি'– বেদনাহত কণ্ঠে বললো– 'আমি নিজেকে নিজে ধোকা দিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে নিজের সঙ্গে নিজে প্রতারণা করেছি'– বিমর্ষ হেসে বললো–

আপনি থানার পুলিশ অফিসার। আমার ব্যপারে আপনার সহমর্মী হওয়া উচিত হবে না। আমি মানুষকে ধোকা দিয়েছি বলেই তো আমাকে পাকড়াও করেছেন......... শুধু একটা কথা বলবো। মানুষ আসলে অসহায়, কিছুই বুঝে না। প্রতারিত হলে তারা খুশি হয়ে যায়। আমার মতো বা মারদান শাহের মতো ছদ্মবেশী পীর যখন কাগজে কিছু এঁকে তাবিজ হিসেবে তাদেরকে দেয়, আশায় তাদের বুক ভরে যায়........

'আমার ব্যপারে আপনি কি কি রিপোর্ট পেয়েছেন জানি না। দেখুন যে বাড়ি থেকে আমি পালিয়েছি সে বাড়ির এত সুন্দরী যুবতী বধূকে আমার সঙ্গে রাত কাটাতে পাঠিয়ে দিয়েছে, গুপ্তধন আর সন্তানের আশায়। অথচ এদের আত্মমর্যাদাবোধ এত টনটনে যে, কেউ তাদের মেয়েদের দিকে চোখ তুলে তাকালে তাকে কতল পর্যন্ত করে দেয়।'

'কিন্তু তুমি নিজেকে নিজে ধোকা দিয়েছে। এ কথার অর্থ কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'শুনবেন সব?'– তার গলায় আকুতি।

'সারমুদ! সারা রাত সামনে পড়ে আছে। আগ্রহভরে শুনবো। তবে মনে রেখো, এ থেকে আমাকে কেসও তৈরী করতে হবে। আমি তোমাকে চাপাচাপি করবো না। তুমিও আমাকে পেরেশান করবে না'।

'মিথ্যা বলবো না আমি একটা কথাও। তবে আপনি কোন অপ্রয়োজনীয় কথা জানতে চাইলেও আমি বলবো।'

*** *** ***

সারমুদের পূর্ণ কাহিনী শোনাতে গেলে সেটা একটা বিশাল বই হয়ে যাবে। কাহিনীর বিরাটাংশ এই মামলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলো না। তবুও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে তার কাহিনী শুনেছি আমি। এখানে সংক্ষেপ করা ছাড়া তাই উপায়ও নেই।

সারমুদ এক আমীর ঘরনার পিতার ছেলে। তার চার বছর বয়সের সময় তার তের চৌদ্দ বছরের বড় বোন মারা যায়। এর দু'বছর পর সারমুদের আরেক বোন মারা যায়। বোন হারানোর দুঃখ সারমুদকে খুব কষ্ট দেয়। তার বয়স ১৩ কি ১৪ যখন হয় তখন মারা যায় তার মা। সারমুদের জন্য তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। সারমুদের আঠারো বছর বয়সে তার বাপও মারা যায়।

শোক তাকে এমনভাবে ক্ষত বিক্ষত করে যে, তার বাবার মৃত্যুর এক বছরের মাথায় সে প্রায় পাগল হয়ে যায়। কান্না ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে পারতো না। ঘুম আর ক্ষুধার অনুভূতি খতম হয়ে গিয়েছিলো। ঘরের ভেতর 'ভয়ের' জমকালো মূর্তি তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো। আত্মীয় স্বজনদের নিয়মিত সঙ্গও তাকে স্বাভাবিক করতে পারলো না।

অবশেষে তার বন্ধুরা দিন রাত পালা করে তাকে সঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

তার এক বন্ধুর এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেম ছিলো। তাদের মিলনের নিরাপদ কোন জায়গা ছিলো না। সারমুদের বাড়িই হয়ে উঠে তাদের প্রেম কানন।

সারমুদের মনোযোগ তখনো প্রেম ভালোবাসার দিকে যায়নি। যাহোক ওদের প্রেমে কোন ধরনের অশ্লীলতা ছিলো না। অত্যন্ত পবিত্র ছিলো। মেয়েটি মুসলমান হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিয়ে ফেললো।

এর মধ্যে সারমুদের সেই বন্ধুর কয়েকশ' মাইল দূরে এক সরকারি চাকুরি হয়ে যায়। বন্ধু চাকুরিতে চলে যায়। চার পাঁচ দিন পর সেই হিন্দু মেয়ে এক রাতে সারমুদের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। এসে সরাসরি সারমুদকে প্রেম নিবেদন

করে। সারমুদের ভেতরটা তখনো পর্যন্ত পরিষ্কার ছিলো। কিন্তু মেয়েটি পবিত্র থাকতে দিলো না।

সে রাত থেকেই সারমুদের জীবন সফর পাল্টে গেলো। যে সফরের শেষ মনযিল হলো থানা পুলিশ।

মেয়েটির অন্য এক ছেলের সঙ্গে আট মাস পর বিয়ে হয়। এই আট মাস সে সারমুদের ঘরে অনেক রাত কাটিয়েছে। তার চলে যাওয়ার পর আরো মেয়ে আসে তার জীবনে। তার জীবন বড়ই আমোদে হয়ে উঠে।

এরপর শুরু হয় তার বিয়ের পালা বা কনে পক্ষদের তাকে নিয়ে টানাটানি। তার এক মামা তার মেয়ের জন্য প্রস্তাব দেয় তাকে এবং তাকে বিয়ের কাজ দ্রুত সেরে ফেলার জন্য চাপ দিতে থাকে।

সারমুদ অসহায়বোধ করতে থাকে। এ অবস্থা দেখে আরো দুই মেয়ের মা তার সমব্যাথী হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। এটা ওটা পাকিয়ে তার ঘরে পাঠাতে থাকে। ওদিকে আরেক মেয়ের বাপও তার হামদর্দ বনে যায়। কখনো কখনো তাকে টেনে হেচড়ে তাদের ঘরে নিয়ে যায়।

এভাবে সারমুদের বিয়ের জন্য চার পাত্রীর মা বাব উঠে পড়ে লাগে। প্রতিদিনই কোন না কোন এক পাত্রীর মা বা বাবা এসে তার বাড়িতে হানা দিতো। আর গল্পে গল্পে বাকী তিনজনের বদনাম রটাতো। এসব বদনামের সারংশ একটাই। কেউ সারমুদকে আসলে চায় না। চায় তার সম্পত্তি। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তার মন তাদের প্রতি চরমভাবে বিঘিয়ে উঠে।

'আমার মার এক পুরনো বান্ধবী একদিন আমাকে সতর্ক করে দেয়'– সারমুদ আমাকে জানায়– 'অমুক অমুক মেয়ের মা মহিলাদের বৈঠকে স্বীকার করেছে যে, সারমুদ ভদ্র ছেলে না হলে কি হবে, আল্লাহ তো তাকে সম্পত্তি দিয়েছে......

এক মেয়ের মার বক্তব্য হলো। সে আমাকে মেয়ে দিচ্ছে শুধু এ কারণে যে, তার মেয়ের কোন শাশুড়িও হবে না; ননদও থাকবে না। ঘরের একলা মালিক তার মেয়েই হবে' .....

'আমার মায়ের সেই বান্ধবী শৈশব থেকেই আমাকে আদর যত্ন করতেন এবং তার কোন মেয়ে ছিলো না। সব সময় তিনি আমার মঙ্গল চাইতেন। এজন্য তার কথা আমি শুধু বিশ্বাসই করলাম না; ঐ পাত্রীদের মায়েদের প্রতি আমার এমন ঘৃণার সৃষ্টি হলো যে, বিয়ের ইচ্ছেই মন থেকে মুছে ফেললাম।'

বিয়ের চিন্তা বাদ দিলেও নিজের ভেতরে সবসময় এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করতো সারমুদ। এই তৃষ্ণা চেপে রাখার জন্য প্রতিদিনই নিজের ঘরে বন্ধুদের

আড্ডা জমাতো। ধুমধাম করে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া চলতো। এক এক দিন এক এক বন্ধু এর খরচ যোগাতো।

তার চমৎকার গান গাওয়ার গলা। স্বভাবগত অভিনয় ক্ষমতা। কৌতুক প্রবণতা এসব গুনের কারণে তার বন্ধু মহল দিন দিন বিস্তৃত হলো।

*** *** ***

এক সময় তালিকাভূক্ত অপরাধীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলো। অবশ্য সে জুয়া খেলা ছাড়া আর কোন অপরাধে জড়াতো না। তার এই দ্বিতীয় শ্রেনীর বন্ধুরা তাকে এক সময় মারদান শাহের ডেরায় নিয়ে গেলো। সেখানেও জুয়ার আড্ডা চলতো। মদের আসর বসতো। মারদান শাহের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

সারমুদ শখের বসে দাড়ি আর বাবরি রেখেছিলো। মারদান শাহ্ তার লম্বা দাড়ি চুলকে কাজে লাগাতে চাইলো। মারদান শাহ্ তাকে একদিন বললো, গ্রামের যেসব ঘরের ছেলেরা ফৌজে যোগ দিয়েছে তাদের মা বাবার একটাই 'মাকসাদ'– তাদের সন্তান যেন সেনা ছাউনিতে থাকে, যুদ্ধে তাদেরকে পাঠানো না হয়। তাহলে যেকোন সময় আহত বা নিহত হওয়ার খবর আসতে পারে।

মজার কারবার হলো এসব ঘরে যদি কোন ফালতু লোকও গিয়ে বলে, তার কাছে এমন বিদ্যা আছে যা তাদের সন্তানদের বা বন্ধুদের গুলির আচর থেকে মুক্ত রাখবে; তারা তখন তার পায়ে সিজদায় পড়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

মারদান শাহ্ সারমুদকে পীর বানিয়ে দিলো। মানুষকে আকর্ষণ করার মতো কিছু বুলি শিখিয়ে দিলো। নিজের একজন চ্যলাও দিয়ে দিলো তাকে। ওদিকে সারমুদও তার এলাকার এক ফ্রডকে শিখিয়ে পরিয়ে নিলো। মারদান শাহ্ এভাবে মোট চারজনকে নকল পীর বানিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিলো।

সারমুদ নিজের বাড়ি থেকে তিন মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকে। মারদান শাহের আস্তানায় থেকে এর মধ্যে ফ্রডবাজির চূড়ান্ত সবক নেয়।

তার চুল দাড়িও ইতিমধ্যে বিশেষ লম্বা হয়ে যায়। সেই বৃদ্ধ নাপিতও তার চুল দাড়িতে কিছু অদলবদল করে দেয়। তাকে যেন চেনা না যায় এজন্য তার বাম চোখে পট্টি বেঁধে দেয় মারদান শাহ্।

সারমুদ যেদিকেই যেতো তার চ্যলারা এগিয়ে গিয়ে তার নামে গুজব ছড়াতো যে, এক গায়েবি পীর এখান দিয়ে যাবে। অমুক গ্রামে তার মোবারক কদম পড়তে পারে। বানিয়ে বানিয়ে তার অনেক আজব কারামত শোনাতো। যে

গ্রামেই হানা দিতো সে গ্রামের কয়েক বাড়ির ভেতরের অবস্থা তার চ্যলারা আগ থেকেই জেনে নিতো। সারমুদ সেসব ঘরেই যেতো।

যেমন আদালতের বোনকে দেখেই সারমুদ বলে দেয়, শ্বশুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে বাপের বাড়ি বসে আছে সে। অবশ্য আদালতের বাড়ি থেকে গুপ্তধনের আবিস্কারের পরিকল্পনা তার নিজের ছিলো।

'আমি জানতাম, মানুষ পীর পূজারী– সারমুদ জবান বন্দিতে বললো– 'কোন বিপদে পড়লেই লোকজন খোদার দরবারে না গিয়ে পীরের সামনে সিজদা করে। কিন্তু আমি এটা জানতাম না যে, পীরের ইশারায় তারা নাচতেও পারে এবং নিজেদের যুবতী মেয়েদেরকে পীরের কাছে হাওলা করে দেয়।.....

'অবশ্য এটা আমার বোকামি ছিলো যে, আমি খাযানার বুজরুকি ও কূপ থেকে পানি উঠানোর ধোকা দিয়ে বসলাম। এটা না করলে সারা প্রদেশ ঘুরে আমি এত টাকা কামাতাম, যা রাখার জায়গা পেতাম না কোথাও। খোদার কসম! যে মেয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি গিয়েছে সেই আমার বুকে লুটে পড়েছে।'

আদালতের স্ত্রী তাজের কাছ থেকে যে আমি জবানবন্দি নিয়েছি এটা ওকে বললাম না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম। আদালতের ঘরেও কি মেয়ে শিকার করেছো?

'ইনস্পেক্টর সাহেব! সে গম্ভীর সুরে বললো– 'আমি আমার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি। আমার আরজ হলো, যেখানে সব কথাই আপনি পরম ধৈর্য নিয়ে শুনেছেন, এটাও তাই গোপন রাখবো না....... আদালতের ঘরের মেয়ে দুটিকেই আমার ভালো লেগেছে। প্রথমে আমি আদালতের বোনকে পটাতে চাইলাম। কিন্তু ঐ মেয়ের আত্মসম্মান বোধ এত প্রখর যে, আমাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলো.......

'আদালতের স্ত্রীকে আমার বেশি ভালো লাগলো। আদালতের অনুমতি ক্রমে তাজ আমার সঙ্গে তিন রাত কাটালো। প্রথম রাতে ইশারা করতেই সে নিজেকে আমার কাছে সপে দিলো....... এই তিন রাত আমার ও তাজের মধ্যে কি কথা হয়েছে সেটা শুনিয়ে বিরক্ত করবো না আপনাকে'.........

'আমি আপনাকে শুধু বলতে চাই, সুন্দরী মেয়েদের সবসময় আমি খেলনা মনে করেছি। একটি খেলনা ভেঙ্গে গেলে আরেকটা হাতে চলে আসতো। আপনি তো জানেন, শয়তানের জগতে প্রেমে ভালোবাসা নেই। স্বার্থপরতা আর যৌন ক্ষুধা মেটানোই এখানকার প্রধান কাজ। কিন্তু তাজের ব্যাপার ছিলো ভিন্ন।

'এই সুন্দরী মেয়ে আমার ওপর জাদুর মতো সওয়ার হলো। মনে মনে ভালো লাগা এক জিনিস। যে মেয়ের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ছিলো তাকে আমার

ভালো লেগেছে। কিন্তু মনের ওপর কেউ আধিপত্য বিস্তার করেনি। তাজ যেন আমার মন-আত্মার ভেতর বাসা বেঁধে ফেললো.......

'কখনো মনে হতো, কত জনম আগ থেকে আমরা পরস্পরকে চিনি। হারিয়ে গিয়েছিলাম। আবার মিলন হয়েছে। তার সামনেও অবশ্য আমি 'চিল্লা কাশির' অভিনয় করেছি। তবে এও বলেছি, তাকে ছাড়া এক মুহূর্তও আমার জীবন কিভাবে কাটবে আমি জানি না। তারপও সে আমাকে আনেক বড় পীর মনে করতে থাকে। আবার আবেগ ভরেও আমার সঙ্গে কথা বলে যায়। আমি বুঝতাম এসব কথা তার অন্তর থেকেই বেরোচ্ছে ......'

'ওকে আমি আমার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিই। সে তখন বলে, ভয় লাগে। পুরো খান্দনের বেইজ্জতি হবে.........

'জনাব! তাজ আমার সামনে বসার পর আমার মনে হলো, আমার ভেতর যে তৃষ্ণার জ্বালা ছিলো সেটা ধুয়ে মুছে গেছে। কোন মেয়ের সঙ্গ আমাকে এভাবে আত্মিক প্রশান্তি দেয়নি।

'এক রাতে কি হলো, ওর মুখটি আমার দু' হাতের মাঝখানে নিয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখ আমার শৈশবে মনে করিয়ে দিলো। ভেসে উঠলো আমার মা বোনের ছবি। আমার চোখে পানি এসে গেলো। তাজ জিজ্ঞেস করলো, আমার চোখে পানি কেন। মৃদু হেসে উত্তর এড়িয়ে গেলাম। সে চুপ করে গেলো। সে হয়তো ভেবেছে, এই পানি পীর ফকিরীর কোন রহস্য হবে........

'জানি না, তাজকে ওখানে রেখে আমি কি করে পালালাম। ওতো আমার পায়ের শিকল বনে গিয়েছিলো। আমার দেহই সেখান থেকে পালিয়েছে, মনটি রয়ে গেলো তাজদের গ্রামে। এর পরের গ্রামে যখন গেলাম তখন স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার উস্তাদি খতম হয়ে গিয়েছে। ভাবতে লাগলাম, এ খেলা এখন ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কূপের কাহিনী হয়ে গেলো.........

*** *** ***

'যা হোক, আদালতের ক্যাপ্টেন ভাই আমার জারিজুরি ধরে ফেললো এবং পাকড়াও করলো আমাকে।'

'ভাগ্যের খেলা দেখুন'– সারমুদ বলে গেলো– 'তাজের ঘরেই আমাকে পৌঁছে দিলো। লোকেরা সেখানে আমাকে মনের ঝাল মিটিয়ে মেরেছে। আদালতের বোন ও মা আমাকে গালি দিতে দিতে লোকদের বলতে থাকে, মারো, ঐ কাফেরকে মারো। ওর হাড়গোড় ভেঙ্গে দাও।

শুধু তাজ এক কোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আমাকে গুপ্তধন আবিষ্কারের কুঠুরীতে বন্দি করে। ওদের বেকুবির অবস্থা দেখুন। আমাকে না বেঁধে এমনিই ছেড়ে রাখে। আমিও আমার সর্বশেষ উস্তাদি খাটিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে মারদান শাহের ওখানে পৌঁছি। পরদিন সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকি। রাতে নাপিত ডেকে চুল দাড়ি সাফ করা হয়।'

'কিভাবে বের হলে?'

'সে আমাকে পুরোনো কাহিনীই শোনালো। কুঠুরীর দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বড় কামরায়, তারপর জানালা খুলে উঠোন পেরিয়ে প্রধান দরজা খুলে......

.... আমি তাকে বললাম, ঐ জানালা দিয়ে যদি সে বের হয়ে দেখাতে পারে তাহলে নগদ পাঁচশ টাকা দেবো'।

'মিথ্যা বলছো কেন সারমুদ? তুমি সেখান থেকে কিভাবে বের হয়েছিলে আমি সব জানি।'

'কিভাবে?'

'তোমাকে কি তাজ বের করেনি?– সে কাহিনী তাকে শোনালাম।

সে আমার দু' হাত জাপ্টে ধরে বড় অনুনা করে বললো, এই কেসে যেন তাজের নাম দেয়া না হয়।

'সেখান থেকে পলানোর অপরাধে– আমাকে যদি ফাঁসিও দেয়া হয় তবুও তাজের নাম আমি নেবো না। আপনি দয়া করুন'– সে বললো।

'তাজের সব কথা শুনে আমিও তাজের সঙ্গে ওয়াদা করেছি, তার কথা কাউকে বলবো না।'

'সে কি বলেছিলো, আমার ভালোবাসার বিনিময়ে আমাকে ওখান থেকে বের করেছে?– সারমুদ জিজ্ঞেস করলো।

'তার ইযযত রক্ষার্থে– আমি বললাম।

'যাহোক সারমুদ নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করার ব্যপারে আমাকে বেশ সাহায্য করলো। ও দিকে মারদানশাহ ও তার দুই চ্যলাও নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়। তবে কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি দেয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন ছিলো।

তাছাড়া আমার রিপোর্ট সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো, সারমুদকে ছদ্মবেশ ধারণ অবস্থায় ধরা যায়নি। তার প্রকৃত চেহারায় কেউ তাকে চিনতো না। তবুও নিজের বানানো কয়েকজন সাক্ষী দ্বারা এই অভাবটা দূর করে নিলাম।

মজর ব্যাপার হলো, আদালতে সারমুদ তার থানার জবানবন্দি থেকে মোটেও সরে যায়নি। সব স্বীকার করে সে। একটু অস্বীকার করলেই জেল থেকে রেহাই পেতো।

তবে মারদানশাহ্ ও তার এক চ্যলা থানার জবানবন্দি অস্বীকার করে বসে। তাদেরকে জব্দ করার জন্য তখন কোন সাক্ষী পাওয়া গেলো না, যে এসে বলবে, এই লোক অমুক নারীর ইযযত লুটেছে।

তারপরও প্রত্যেকের দু' বছর করে জেল হলো। রায় শেষে তাদেরকে যখন কোর্টের বাইরে আনা হলো, সারমুদের হাতে তখন হাত কড়া। কিন্তু তার ঠোঁটে বেপরোয়া হাসি। সে আমাকে কাছে ডেকে নিজের হাত বাড়িয়ে আমার এক হাত টেনে নিয়ে বললো,

'আমি সহজেই মুক্ত হতে পারতাম। উকিল আমাকে বারবার বলেছে, তুমি মাত্র একবার অস্বীকার করো। বলো, আমাকে মেরে মেরে জবানবন্দি নেয়া হয়েছে। আমি শুধু দেখছিলাম, আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করেন কিনা। আপনি সাক্ষীতে যেই তাজের নাম উচ্চারণ করতেন আমি আমার জবানবন্দি অস্বীকার করে বসতাম। আপনি তাজের সম্মান রেখেছেন আমিও আপনার সম্মান রেখেছি।'

যে রাতে সারমুদ থানায় আমার কাছে জবানবন্দি দেয়, সে রাতে সে এক পর্যায়ে বড় হতাশ ও বেদনাহত কণ্ঠে বলে ছিলো—

'হায় তাজকে আমি সারা জীবন পাবো না। আর সারা জীবনই মানুষকে ধোকা দিয়ে যাবো।'

তখন থেকেই আমার মনে এক গোপন প্রার্থনা ছিলো, কোনভাবে যদি সারমুদের স্বপ্ন পূরণ হতো!'

*** *** ***

এজন্যই বোধ হয়, এই মামলা তো শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু কাহিনী আরো নাটকীয়তার দিকে এগিয়ে গেলো। এই মামলার বেশ অনেক দিন পর বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে অন্য এক থানায় ইনচার্জ দেয়া হলো। সেখানে দু' বছর কাটানোর পর জরুরী ভিত্তিতে আবার সারমুদ যে শহরে থাকতো সে শহরের থানায় পোস্টিং দেয়া হলো।

আগের থানায় থাকতেই আমি ততদিনে সারমুদের স্মৃতি প্রায় ভুলে গেছি। পৌনে তিন বছল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যে হাজারো মামলা আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। কতজনের কথা মনে রাখা যায়।

এই থানায় আসার পনের ষোল দিন পরের ঘটনা। থানার এক হেড কনস্টেবল ও আরেক কনেস্টবল মারামারির অভিযোগ তিনজনকে থানায় নিয়ে এলো। তাদেরকে বাইরে বসিয়ে হেড কনষ্টেবল এসে আমাকে জানালো, এদের একজন এই শহরেরই। দু' জন্য দেহাতী অর্থাৎ গ্রামের দেহাতীরা শহরির ওপর প্রকাশ্যে বাজারে ছুড়ি দিয়ে হামলা করে।

শহরি এতে মোটামুটি যখমী হয়। শহরির হাতে সাইকেলের একটা হেন্ডেল ছিলো। আত্ম রক্ষার্থে শহরিও সে হেন্ডেল দিয়ে পাল্টা আঘাত করে। বাজারের লোকেরা তাদেরকে তাড়িয়ে দিলো। কিন্তু দেহাতীরা নিয়ন্ত্রণে আসেছিলো না। দুই পুলিশ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। হাঙ্গামা দেখে সেই তিনজনকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে।

তিনজনকে ভেতরে আনা হলে আমি শুধু চমকেই উঠলাম না। প্রচন্ড এক ধাক্কা খেলাম ভেতর ভেতর। এক লহমায় চিনে ফেললাম।

তিনজনের একজন সারমুদ, আরেকজন আদালত, অন্যজন আদালতের এক আত্মীয়। আমি বুঝে ফেললাম, মারপিটের কারণ কি? কিন্তু তাদের কথা শোনার পর দেখা গেলো ব্যপার আরো অনেক সঙ্গিন।

আগে যখমগুলো দেখলাম। সারমুদের মাথার একটা জায়গায় চার পাঁচ ইঞ্চি হিড়ে গেছে। আর সারমুদের আঘাতে তারা শুধু ব্যথা পেয়েছে, যখমী হয়নি।

থানায় ফাষ্ট এইড-এর ব্যবস্থা ছিলো। সারমুদের মাথায় ব্যান্ডেজের কথা বলে ওদের চোটে ঔষধ লাগিয়ে দিতে বললাম।

প্রথমে আদালতকে জিজ্ঞেস করলাম, সারমুদকে সে কেন হত্যামূলক আক্রমণ করলো।

'ওর কাণ্ড কারখানার কথা কি আপনার মনে নেই?' আদালত আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমাকে প্রশ্ন করবে না– আমি রাগত কণ্ঠে বললাম– সব মনে আছে আমার। সে তোমাকে গুপ্তধন ও তোমার স্ত্রীকে সন্তান দেয়ার ধোকা দিয়েছিলো। আর তুমি ছয় সাত রাতের জন্য তোমার স্ত্রীকে তার কাছে হাওলা করে দিয়েছিলে। আইন তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে দিয়েছে। তুমি এখ কি চাও? তুমি ওকে হত্যার জন্য যে হামলা করেছো এর শাস্তি সাত বছরের জেল। দশ বছরও হতে পারে।'

'জনাব!– আওয়াজ তার মৃত প্রায়– আসল কথা হলো, আমার স্ত্রীকে সে বিয়ে করে ফেলেছে।'

আমি অত্যন্ত হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

'সে কি তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে? যদি অপহরণ করে থাকে তুমি থানায় রিপোর্ট করলে না কেন?'

'আমি রিপোর্ট করবো কিভাবে জনাব?– আদালত বলে গেলো– 'আমি তো আমার স্ত্রীকে আগেই তালাক দিয়ে দিয়েছি।'

ঘটনা পুরোটা খুলে বলতে বললাম।

'জনাব!– আদালত বলতে লাগলো– 'সে অপরাধী হিসেবে ধরা পড়ার পর যখন পালিয়ে গেলো এর কিছু দিন পরই আমার স্ত্রীর মধ্যে মা হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলো। তিন মাস অপেক্ষার পর নিশ্চিত হলাম, আমার স্ত্রীর সত্যি মা হতে যাচ্ছে।

যদি এই লোক সত্য পীর হতো তাহলে বুঝতাম এটা তার দুআর বরকত, কিন্তু এতো বড় বাটপার। আমার সন্তান জন্ম দেয়ার মতো ক্ষমতা নেই। এই গর্ভ ঐ ধোকাবাজের। স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম তালাকনামাও। তারা ঝামেলা করলেও টিকতে পারলো না.........

'সেই বাচ্চার বয়স এখন দুই বছর। বাচ্চা হওয়ার পর তাদের গ্রামের কোন নারী পুরুষ তার দিকে মুখ ফেরাতেও ঘৃণাবোধ করতো। ওর মা বাবা ভাই বোনও তাকে গলা ধাক্কা দিতো। সবাই বলতো, হারাম সন্তানের মা হয়েছে। বাচ্চার বয়স ছয় মাস হওয়ার পর সে বাচ্চা নিয়ে লাপাত্তা হয়ে গেলো। দেড় দুই মাস পর জানা গেলো, সে ঐ বদ পীরের কাছে আছে। তাকে বিয়ে করে ফেলেছে' ....

'আজ আমি কোন এক কাজে শহরে এসে একে পেয়ে গেলাম। জেল খেটে এসেছে জানতাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বদ মায়েশির ফল তো ভোগ করে এসেছো তাই না? এ বদকারনি কি এখন তোমার কাছে? উত্তরে সে এমন কথা বললো, আমার আত্মমর্যাদা বোধে বড় আঘাত লাগলো। আমি উত্তেজিত না হয়ে পারলাম না' ....

'তোমার মধ্যে আবার আত্ম মর্যাদা আর উত্তেজনাও আছে?– আমার রক্ত টগবগ করে উঠলো– 'ছিঃ। গুপ্তধনের লোভে নিজে বউকে ভণ্ড পীরের কাছে সপে দিয়েছো। আর এখন অপবাদ দিচ্ছো, সে হারাম বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। আমার তো সন্দেহ হয় তুমিও এমনই কোন পীরের ছেলে'–

আমি আরো আশ্রাব্য কিছু বলে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর বললাম–

'তোমাকে ৩০৭ ধারা মোতাবেক গ্রেফতার করে সাত বছরের জেল দেবো।'

এ কথা বলে তাকে হাজতে ভরে ফেললাম। অবশ্য এর উদ্দেশ্য ছিলো তাকে ভয় দেখানো। তারপর আদালতের গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলাম, কেউ এসে তাদের ভালো হয়ে চলার জামানত দিয়ে আদালতকে ছুটিয়ে নিয়ে যাও।

*** *** ***

'এরপর সারমুদের কাছে জানতে চাইলাম এসব কি হচ্ছে?' তার কাহিনী খুব দীর্ঘ। তবে সংক্ষেপে একরম ঃ

সারমুদের জেল ছিলো দুই বছরের। কয়েদখানায় তার সদাচরণের জন্য চার মাসের শাস্তি মাফ করে দেয়া হয়। তাজ তার মন থেকে মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয়নি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাজের জন্য সে ব্যকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু কিভাবে সম্ভব তাজকে এক নজর দেখা।

এক মাস পর মারদান শাহের এক চ্যলার সঙ্গে তার দেখা হলো। সে জানালো, তোমার প্রতারণা তাকে তালাক দিয়ে দেয়। আর তাজের জীবন হয়ে গেছে অচ্ছুতের জীবন।

তাজের এ অবস্থার কথা শুনে তো সারমুদের পাগল হওয়ার অবস্থা। সে মারদান শাহের কাছে গিয়ে হাজির হলো। তাকে বললো, সে তাজের খবরাখবর জেনে তাজ এর কাছে একটা প্রস্তাব পাঠাতে চায়।

মারদান শাহের হাত অনেক লম্বা ছিলো। জেল খেটে আসার পরও তার তাবিজের কদর একটুও কমেনি। এক মহিলাকে তাজের খোজ খবর নেয়ার জন্য ঠিক করলো সে।

পরদিনই তাজ এর খবর জানা গেলো। বাচ্চা নিয়ে তাজ মা বাবার সঙ্গেই থাকে।

কিন্তু সে ঘরে নওকরদেরও ইযযত আছে। তাজ-এর কোন ইযযত নেই। ওর বাচ্চাকে নানা নানী ছুয়েও দেখে না। তাজ-এর মতো এমন সুন্দরী মেয়েকে যে কেউ বিনা শর্তে বিয়ে করতে রাজি হবে। কিন্তু সেখানকার মেথরও তাজ-এর নাম শুনলে নাক ছিটকায়।

'তোমার ঝুলি পয়সায় ভরে দিবো'– সারমুদ ঐ মহিলাকে বললো– 'কাল মাঝ রাতে যেন তাজ তাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে চলে আসে। তার বাচ্চাটিকেও সাবধানে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আমি সেখানে থাকবো। তাকে বলবে, সারমুদ এখন ভদ্র জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু তাজ যদি তার কাছে না আসে তাহলে সে গুণ্ডা বদমায়েশেরও অধম হয়ে যাবে।'

খবর পেয়ে তাজ সারমুদের প্রস্তাব মনে প্রানে গ্রহণ করলো। মহিলার কাছে খবর পাঠিয়ে দিলো, সে সঠিক সময়ে বেরিয়ে আসবে।

সারমুদ মারদান শাহের একটি ঘোড়া নিয়ে তাজদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাইলো।

তাজ আসতেই সারমুদ বাচ্চা সমেত তাজকে জড়িয়ে ধরলো। তাজও গাঢ়ভাবে সাড়া দিলো। দু'জনের চোখের মিলনের অশ্রুতে ভরে গেলো। সারমুদ তাজকে ঘোড়ায় উঠালো। বাচ্চা তাজ-এর কোলেই ছিলো।

'এখন আর তোমাকে ধোকা দেবো না'- সারমুদ আশ্বাসের গলায় বললো।

'এর চেয়ে বড় ধোকা আর কি হতে পারে?'- তাজ ফুপিয়ে উঠলো- 'যে জাহান্নামে গত দু'বছর জ্বলে পুড়ে মরেছি এর চেয়ে বড় ধোকা আর কি হতে পারে?'

সারমুদ তাকে শান্ত করলো। ফোলা ফোলা চোখের তাজকে সারমুদের মনে হলো, সদ্য কলি ফোটা বিশ বছরের অপসরা যুবতী। শত ঝড়ঝাপটা তাকে মমিন করতে পারেনি। ধুয়ে মুছে তার রূপকে আরো বিকাশিত করেছে।

সারমুদ নিজের বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটালো। ঘোড়া যেন পংখিরাজের মতো উড়ে চললো।

পথে তাজ ওকে বললো, মা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতেই তার স্বামী আদালত তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। অকথ্য নির্যাতন শুরু করে। তারপর তাকে তালাক দিয়ে দেয়।

'যে গ্রামে যে বাড়িতে আমার দাপট চলতো'- তাজ বললো- 'সে গ্রামের দাসী বাদীর শ্রেনীর মেয়েরাও আমার সঙ্গে কথা বলতো না।'

ফজরের আযানের পূর্বেই ওরা পৌঁছে গেলো সারমুদদের বাড়িতে। ফজরের নামাযের পর পাশের মসজিদের ইমাম সাহেবকে বাড়িতে নিয়ে এলো সারমুদ। ইমাম সাহেব তাজ ও সারমুদের বিয়ে পরিয়ে দিলেন।

তারপর দুপুরের আগে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তাদের বিয়ের রেজিষ্ট্রিও সেরে ফেললো।

রাতের বেলা সারমুদের বন্ধুরা মিলে বড়সড় এক পার্টির আয়োজন করলো। বন্ধুরাই সারমুদের ঘরে বাসর সাজালো। এবং দু'জনকে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সবাই বিদায় নিলো।

যা হোক, সারমুদ ভয়ে ভয়ে ছিলো। তাজ এর পরিবারের কেউ প্রতিশোধমূলক কোন ক্ষতি বা তার ওপর হামলা করতে পারে। হামলা ঠিকই

করলো, তবে তাজ এর পরিবারের কেউ না। বরং তাজ এর পূর্ব স্বামী আদালত। তবে সারমুদ বেঁচে গেলো।

আমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিলাম। রাতের মধ্যেই আদলত ও তার আত্মীয়ের জামিন হওয়ার জন্য লোকজন চলে এলো। তাদের গ্রামের চৌকিদার ও মেম্বরও আসলো।

আমি আদালত ও তার লোকদের কাছ থেকে লিখিত জামানত নিলাম, এখন থেকে তারা সারমুদ ও তার স্ত্রীকে কোন ধরনের বিরক্ত করবে না। কেউ যদি সারমুদের ওপর হামলা করে আর হামলাকারীকে ধরা না যায় তখন আদালত ও তার সঙ্গীরাই গ্রেপ্তার হবে। তাদের জামিনদাররাও সন্দেহ ভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার হবে।

সারমুদকেও সতর্ক করে দিলাম, সে যেন এখন থেকে কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত না হয়। তাহলে তার কপালেও খারাবি আছে।

'আমার ভেতরের সেই অপ্রাপ্তি আর শূণ্যতার আগুন নিভে গেছে। সেই আগুনই আমাকে অন্ধকার জগতে নিয়ে গিয়েছিলো'–

সারমুদ সতেজ গলায় বললো–

'আমার জীবন থেকে যা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো সেই মহান সত্তা তাজ ও তার সন্তানের রূপে আমাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। খোদার দরবারে আমি এখন সত্যিকারের তওবা নিয়ে হাজির হবো। তবে এর জন্য এখন প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালা এক পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবো। শুনেছি তিনি থাকেন ইউপির সাহারানপুরের দেওবন্দে।

হৃদয়ের কাঁটা

সবাই তাকে চাচা মাজেদ বলে। না, পাড়ার বুলি হিসেবে মাজেদ সাহেবকে চাচা মাজেদ ডাকা হতো না। এই ডাকার মধ্যে শ্রদ্ধা আর সমীহের সরল অভিব্যক্তি ছিলো। কারণ, বিধাতা তাকে এমন সুর মাধুরী দান করে ছিলেন যার সুর তরঙ্গ পথিকের পথ রোধ করে দিতো। তবে তিনি 'হিরু ওয়ারিস শাহ' গীতি ছাড়া আর কিছুই গাইতেন না।

তার গাওয়ারও কোন সময় ছিলো না। কখনো অর্ধ রাতের পর তার সুর লহরী চাঁদ তারাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলতো। কখনো মধ্য দুপুরের উধাস হাওয়ায় হঠাৎ তার সুর বেজে উঠতো। সারা গ্রাম নিথর স্তব্ধ হয়ে যেতো।

কিন্তু কেউ হাজার অনুরোধ করলেও তার গলায় সুর উঠতো না। দু' টুকরো বিষন্ন হাসি উপহার দেয়া ছাড়া আর কিছু দিতেন না তখন। তবে অতিথি এলে তাকে নিরাশ করতেন না। একটু বললেই হতো। চাচা মাজেদ বলতেন, আমার এই মেহমান হিরু ওয়ারিশ শাহ শুনতে এসেছে। মেহমানকে তিনি খুশি করে দিতেন।

একবার সে গ্রামে আমাকে আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হলো। তখনই আমি তার সুরের ভক্ত হয়ে যাই। মনে করেছিলাম তার সুরে কেবল সাধারণ আকর্ষণই আছে; কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পর অনুভব করলাম, এর মধ্যে গভীর দাগের কোন কাহিনী আছে।

সে গ্রামে যাওয়ার পট ভূমিটা ছিলো এরকম–

অন্য এলাকার এক পীরের মুরিদ ছিলাম আমি। এর অর্থ এই নয় যে, আমি অশিক্ষিত, গোঁয়ার। পরীক্ষা না দিলেও বি.এ. পর্যন্ত পড়া আছে আমার। তবে আমার বাবার মুখে শৈশব থেকেই সেই পীরের কারামত শুনে এসেছি।

আমাদের বংশের সবাই ঐ পীরের মুরিদ। পীরের গদি আমাদের এলাকা থেকে একটু দূরে। বছরে দু'বার পীরের আস্তানায় যেতাম। একবার শুধু সালাম করতে। আরেকবার বাৎসরিক উরসে।

অন্যদের মতো আমিও বিশ্বাস করতাম, পীরের কজায় জ্বিন আছে। কাউকে যদি জিন উত্যক্ত করতো পীর সেই জিনকে হাজির করে শাস্তি দিতেন। এ ধরনের অনেক কাহিনী আমি সত্য বলে বিশ্বাস করতাম।

সে বছর উরসে গিয়ে আমার এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। উরসে কাওয়ালির তিনটি দল এসেছিলো। কাওয়ালি আমার খুব প্রিয়। কাওয়ালির এক গায়কের সুর আমার কাছে খুব ভালো লাগলো। আমার সহকর্মীকে তার কথা বলছিলাম।

'তুমি হৃদয়কাড়া সুর যদি শুনতে চাও আমাদের গ্রামে চলো'– সহকর্মী বললো।

সে চাচা মাজেদের কথা বললো। বিভিন্ন কাওয়ালি ও গানের দল তাকে তাদের দলে ভেড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি এসবে পাত্তা দেন না। পীরেরাও তাকে উরসের সময় দাওয়াত করেন। তিনি সাড়া দেন না। আমার সহকর্মীর কথা শুনে মনে হলো, চাচা মাজেদ অন্যদের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম এবং পোড় খাওয়া মানুষ।

*** *** ***

রাতে চাচা মাজেদের বাড়িতে আমার মেজবান সহকর্মীর সঙ্গে বসেছিলাম। চাচার বয়স পৌঢ়ত্বে ছাড়িয়ে গেছে। তার ও এক স্ত্রীর সংসার এটা। একেবারে আটপৌঢ়ে। দরিদ্রই বলা যায়। তবে বেশ হাসিখুশি। অভাবের জন্য তাদের মধ্যে কোন হাপিত্যেশ নেই।

চাচা মাজেদ অতিথির অনুরোধ পেয়ে আমাকে ওয়ারিশ শাহ শোনাতে বসলেন। গাওয়া শুরু করলেন। ঢোক, তবলা, হারমেনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র নেই। তাতে কি? চাচার কণ্ঠে সবকিছুই যেন ঝংকৃত হচ্ছে। কেমন গম্ভীর জ্বালা ধরা সুরে গেয়ে চলেছেন।

এক কলি শেষ হওয়ার আগেই দু'চারজন করে শ্রোতার দল আসতে লাগলো। সবার স্থান মাটিতে। মাটিতে একটা শতরঞ্চি পাতা আছে। আশ্চর্য সেখানে কেউ বসছে না। যেন সেখানে বসলে চাচা মাজেদের সঙ্গে বেয়াদবি হবে।

সেখান থেকে আমি যে সুধা নিয়ে ফিরলাম তা আমার শুকনো জীবনকে করে তুললো রসাবৃত। আমার সহকর্মী তার সম্পর্কে পরে এমন দু'একটা কথা বলেছিলো, যার টানে পনের ষোল দিন পর আমি আবার সে গ্রামে গিয়ে উঠলাম।

উপহার হিসেবে দুটো জিনিস নিয়ে গেলাম। চাচী অর্থাৎ চাচা মাজেদের স্ত্রীর খুব পছন্দ হলো সেগুলো। সারাদিন সেখানে রইলাম। সন্ধ্যায় ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পর আবার গেলাম। তৃতীয় সাক্ষাতে চাচা মাজেদ আমাকে ছেলের মর্যাদা দিয়ে দিলেন। তাদের কোন ছেলে মেয়ে নেই।

আমার সহকর্মীর কাছ থেকে তার সম্পর্কে যা শুনেছিলাম চাচা মাজেদ তার কিছু সত্য বলে জানালেন। আর কিছু গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন। চতুর্থ সাক্ষাতে তিনি আমাকে তার জীবনের অতি চমকপ্রদ কাহিনী শোনালেন।

*** *** ***

'দক্ষিণ পাঞ্জাবের এক গ্রামে দরিদ্র এক পিতার ঘরে আমার জন্ম'। –চাচা মাজেদ নিজের জীবনের গল্প শুরু করলেন।

বুঝতে শিখার পর আমার বাবাকে বিত্তশালীদের ঘরে চাকর খাটতে দেখেছি। যার বিনিময়ে আমরা দানা পানি পেতাম।

ঈদের সময় সালামী আর রঙ্গীন কাপড় পেতাম। আমার বাবার মতোই আমি সেই ছোট থেকেই উঁচু জাতের লোকদের বেগার খাটতে শুরু করি......

'কিন্তু উচু নিচুর এই ফারাক আমি মেনে নিতে পারতাম না। শীত বা গরমে কখনো জুতা পায়ে দেয়ার ভাগ্য হয়নি। আমার বয়সের ছেলেরা কত সুন্দর সুন্দর জুতা পরতো। দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার একটিই কাপড় ছিলো। সেলওয়ার বা চাদর কেবল ঈদে পড়তে পারতাম........

'বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেও চৌধুরী বাড়ি থেকে ডাক আসলেই ছুটতে হতো বাবাকে। একান্তই যেতে না পারলে আমার মা যেতো। পুরষালী কাজ হলেও আমার মাকেই করতে হতো।......

'বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরের এই অনুভূতি দৃঢ়তর হলো যে, আমিও ওদের মতোই মানুষ যারা আমাকে ও আমার মা বাবাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কোত্থেকে এ অনুভূতি আমার ভেতর জন্ম নিলো জানি না।

পড়া লেখা জানতাম না তাই এসব কথা বই থেকে পড়ারও প্রশ্ন উঠে না। কেউ বলেওনি এসব কথা। না কখনো তারা এই ভাগ্যহত জীবনের জন্য দুঃখবোধ করেছে। তারা আমাদের এই লাঞ্চনার জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের জন্য সম্মানজনক জীবনের কল্পনাও করেনি.....

'মনে মনে আমি যাই ভাবি না কেন তা তো প্রকাশ করার মতো সাহস ছিলো না। তবে খোদা আমাকে কণ্ঠ দিয়ে আমার জ্বালা কিছুটা হলেও ভুলে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন।.....

'আমাদের গ্রামে এসে এক অন্ধ গায়ক ওয়ারিস শাহের সংগীত গাইতেন। তার কাছ থেকে শুনে শুনে আমি কয়েকটা কলি মুখস্থ করে নিই। ক্ষেত খামারে গিয়ে সেই কলিগুলো গুন গুন করে আওড়াতাম। নিজের কণ্ঠ নিজের কাছেই বেশ লাগতো।

একদিন সেই অন্ধ গায়ককে ধরলাম, আমাকে গান শেখাতে হবে। তিনি তখন আমার গানের গলা শুনতে চাইলেন। আমি শোনাতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আমার গুরু হয়ে গেলেন। ওয়ারিশ শাহের অনেক গান জানি আমি। সব তার কাছ থেকেই শোনা এবং শেখা........

'গ্রামের লোকেরা আমার কাছে ওয়ারিস শাহ্ শুনতে চাইতো। আমার কাছে ভালো লাগতো। আমি ভেবে ছিলাম, এই কণ্ঠের কারণে হয়তো সবার চোখে আমি কিছুটা হলেও সম্মানের পাত্র হবো। কিন্তু এ ছিলো আমার অলীক কল্পনা। উচু জাতের লোকেরা আমাকে তাদের ব্যবহারে জানিয়ে দিলো যে, তোমার কণ্ঠের মূল্য থাকতে পারে, তোমার কোন মূল্য নেই আমাদের কাছে।

কখনো কোন চৌধুরীর বাড়িতে অতিথি এলে আমার ডাক পড়তো। আমাকে ফরশের ওপর বসিয়ে বলতো–

'আরে ছেমরা! ওয়ারিস গীত শোনা!'

'আমি গেয়ে শোনানোর পর হুকুম হতো– 'যা, যা ভাগ'। আমি সেখান থেকে চলে আসতাম'.....

'এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেলো। কারো হুকুমে গাইতে আমার ইচ্ছে হতো না, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিতাম।

'আমার গ্রাম থেকে তিন চার মাইল দূরে এক পীরের আস্তানা ছিলো। সেখানে একটি প্রসিদ্ধ মাজারও আছে। তার মুরিদ দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। শোনা যেতো, জিনদের মধ্যেও তার মুরিদ আছে। তারা সালাম করতে আসে নিয়মিত।

পীর মধ্য বয়স্ক ছিলেন। তার প্রথম স্ত্রী এক যুবক ছেলে রেখে মারা যান। তারপর পীর আরো দুই বিয়ে করেন। একজনের বয়স হবে ত্রিশ বত্রিশ। আরেকজন সদ্য যুবতী। বয়স তার ছেলের সমান.....

'একদিন আমার অন্ধ গুরু আমাকে সেই পীরের কাছে নিয়ে গেলেন। পীর সাহেব নাকি ওয়ারিসশাহ ও সুরেলা কণ্ঠের পাগল। আমার বয়স তখন ষোল কি সতের। পীরের নির্দেশে আমি গেয়ে শোনালাম।.....

'শেষ হতেই পীর আমার অন্ধ গুরুকে বলে উঠলেন–

'হাফেজ! এই ছেলে তোমার নাম ডুবাবে।

তাকে হাফেজ বলেই ডাকা হতো।

হাফেজ বললেন, ইয়া সরকার! এতো আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। আমি তো সরকারকে খুশি করতে চেয়েছি। এজন্য আমার চেয়ে মধুর কণ্ঠস্বর আপনার দরবারে হাজির করেছি.........

*** *** ***

'আমার গান শুনে খুশি হয়ে পীর সাহেব তার মুরিদ বানিয়ে নিলেন আমাকে। সেদিন থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার দরবারে হাজিরা দিতাম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানে মেলা বসতো। বিভিন্ন পেশার নারী পুরুষ দলে দলে মাজারে বাতি জালাতে ও পীরকে সালাম করতে আসতো। যুবতী ও মেয়েরাও আসতো.........

'আজকাল তো ফিল্মি আর অবাস্তব গান চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সুরেলা কণ্ঠস্বরও কমে গেছে। আমাদের সময় লোকেরা ওয়ারিস শাহ, ইউসুফ যুলেখা ও সাইফুল মুলুকের গীত শুনতো।

গায়কদের পেছনে লম্বা লাইন দেখা যেতো। গভীর রাতে তাদের কণ্ঠ ধ্বনি যে পর্যন্ত পৌছতো সে পর্যন্ত মুগ্ধতার নৈঃশ্বদ নেমে আসতো। লোকেরা পছন্দ করতো সুরেলা কণ্ঠ।

সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গে যদি আবেগ মথিত শব্দ ছন্দের সঙ্গীত হতো মেয়েরা তো তখন পাগলপারা হয়ে যেতো। দেখবে, ছিনেমার গান যত ভালোই হোক, মানুষ বেশিক্ষণ শুনতে পারে না। কিন্তু ওয়ারিস শাহের মতো প্রাচীন সঙ্গীত-কলার ক্ষেত্রে আজো মানুষের আকর্ষণ কমেনি........

'সেটা ছিল আসলে পৌরুষদীপ্ত যুগ। দামী পোষাকের চেয়ে সুগঠিত স্বাস্থের কদর ছিলো বেশি। পোশাকের চাকচিক্য দেখা হতো না। দেখা হতো পোশাকের ভেতরের দেহটা কেমন। কুস্তি কাবাডি ছিলো মানুষের প্রিয় বিনোদন।

কোন গ্রামের পালোয়ান বা কাবাডি খেলোয়াড় যদি হেরে যেতো সারা গায়ের নাক কাটা যেতো। আমাদের গাঁয়ে বারজন বিখ্যাত কাবাডি খেলোয়াড় ছিলো। তাদের পেশী বহুল দেহগুলো দেখার মতো ছিলো। তাদেরকে আমার এত ভালো লাগতো যে, আমিও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে শুরু করলাম.........

'ওয়ারিস শাহ্ গেয়ে যেমন নাম হয়ে গেলো। কাবাডির কোর্টে নামার পরও বড় বড় খেলোয়াড়রা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলো যে, চেষ্টা করলে আমিও নামাকরা খেলোয়াড় হতে পারবো। তাদের উৎসাহে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো।

ছয় মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণ আমাকে আমাদের গ্রামের মান রাখার উপযুক্ত করে তুললো।

গাঁয়ের বড় চৌধুরী আমার জন্য রোযানা এক সের দুধের ব্যবস্থা করে দিলেন। আরেক চৌধুরী খাঁটি ঘি ও মধুর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে আমার স্বাস্থ্য এমন চমৎকার হয়ে উঠলো যে, আমার চেয়ে বয়সে বড় যুবকরাও ঈর্ষা করতো..........

'প্রথম দফায় তিন চার গ্রামের সঙ্গে জিতে এলাম আমরা। আমাদের জেলার এক গ্রামের কাবাডি খেলোয়াড়দের খ্যতি ছিলো দূরদূরান্ত পর্যন্ত। আমরাই ওদেরকে হারিয়ে ভালো একটা শিক্ষা দিয়ে দিলাম।

মাজারের উরসে কাবাডি খেলা হতো। পীরের মুরিদ, মুসলমান হিন্দু সবাই খেলা দেখতে আসতো। ঐ গ্রামের খেলোয়াড়রাও আসতো। শক্ত লড়াই হতো। হার জিতের মধ্যে ব্যবধান হতো উনিশ বিশ।

ওদের গ্রামেও আমরা কাবাডি খেলতে গিয়েছি। কাবাডি খেলা শেষ হওয়ার পর আমাদের বেশ ঘরোয়া আপ্যায়ন করতো তারা। আর প্রতিবারই ওয়ারিশ শাহ শোনাতে হতো আমাকে। গাওয়া শেষ করার পর নযরানাও মিলতো......

'গায়ক ও খেলোয়াড় হিসেবে আমার তো বেশ নামডাক হয়ে গেলো। কিন্তু আমি রয়ে গেলোম নিচু জাতের সেই অচ্ছুত মানুষ। কয়েকবারই আমার কানে একথা এসেছে–

'জাত তো কামিন, তবে খোদা গুন দিয়েছে ছেলেটাকে।'

গ্রামে আমার আলগা একটা সম্মানের স্থান হয়ে গেলো। কিন্তু উঁচু জাতের কারো সঙ্গে বসতে পারতাম না। আর বেগার খাটারও কোন শেষ ছিলো না.......

'জাতপাতের এই নিচুতা আমাকে বড় কষ্ট দিতো। এক সময় আমি গ্রামের বাইরে বাইরে কাটাতে লাগলাম। বেশির ভাগ সময় পীরের আস্তানায় কাটতো। পীরও আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

কিছু দিনের মধ্যে সেখানকার এমন কিছু লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়ে গেলো যারা জুয়া খেলা, চুরি করা এসব কাজকে অন্যায় মনে করতো না।

এরাও আমার মতোই কামিন জাতের লোক ছিলো। কামিন জাত হওয়ার কারণে যেন পীর এদেরকে আরো বেশি পছন্দ করতেন।

দেখতাম, মাঝে মধ্যে ওরা পীরের সঙ্গে ভেদের কথাও বলে। এদের দলে আমি ভালো করেই মিশে গেলাম। এক সময় তাদের জুয়ার আড্ডায়ও আমার স্থান হয়ে গলো.....

*** *** ***

'মাজারে অনেক মেয়ে ছেলেও আসতো। একদিন পীরের ডেরার দিকে যাচ্ছিলাম। পথের দু'পাশের গম ক্ষেতের শীষগুলো বেশ উঁচু হয়ে উঠেছে। এখনো হলুদ বর্ণ ধারণ করেনি রং। বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে গমের শীষ..........

'আমি প্রকৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে হাটছিলাম। আচমকা ক্ষেতের আল থেকে এক মেয়ে বেরিয়ে আসলো। যেন নীল পরী। রূপ যেন নিসর্গের সাজকেও হার মানায়। দেখেই বুঝলাম, বিত্তশালী ঘরের.........

সে হেসে জিজ্ঞেস করলো, পীরজির কাছে যাচ্ছো?'

আমি বললাম, হ্যাঁ.......

'সে বললো, একটু আস্তে হাটো। আমিও ওদিকে যাচ্ছি' বলতে বলতে আমার পাশে চলে এলো।

হাটছে আর কথা বলছে এমন করে, যেন সে আমার গ্রামের মেয়ে। শিশু কাল থেকেই আমাদরে পরিচয়। আমি তার গ্রামের নাম জানতে চাইলাম। সে যে গ্রামের কথা বললো, সে গ্রামে অনেকবার কাবাডি খেলতে গিয়েছি। ওরা কখনোই জিততে পারেনি আমাদের সঙ্গে।

মেয়ের নাম তামীমা বানু, বাবার নাম শুনে তো ঘাবড়ে গেলাম। সে গ্রামের বিশিষ্ট ধনী আর চৌধুরী জাত। আমার ভয় পাওয়ার কথা ছিলো না। কারণ আমার মনে কিছুই ছিলো না। কিন্তু সে যাচ্ছিলো আমার সঙ্গে ......

'কেউ দেখে ফেললে আমাকে বেইজ্জতিও করতে পারে। আর একথা তো বলবেই, 'আরে কামিন জাত! তোর এত বড় সাহস?'

আমি একবার দ্রুত পা চালিয়ে ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। তামীমা খপ করে আমার হাত ধরে বললো– আমাকে রেখে পালিয়ে যেতে পারবে না।'–

ওর মুখে ও ঠোটে রাঙাবর্ণ খেলে যেতে দেখলাম। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা না থাকলেও এবং আনাড়ি হলেও এই দূরন্ত বয়সের যে কোন ছেলেই এর অর্থ বুঝতে পারবে। আমি শিওরে উঠলাম। ওকে এড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও ছিলো শাহজাদী আর আমি গোলাম.......

'যেমন খুশি তেমন হুকুম সে আমার ওপর চালাতে পারে। উঁচু জাতওয়ালারা কোন পাপ করলে নিজেদের অধিকার আছে মনে করেই করে।

তামীমা বললো– 'তুমি এমন ভীত হয়ে পড়লে কেন? কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো, মাজার যাচ্ছি। একে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

'অর্থাৎ ও বলছিলো, উচু জাতের মেয়েরা কামিন ছেলেদেরকে নিজেদের হেফাজতের জন্য নিয়ে যায়...... আমরা পীরের আস্তানায় পৌঁছে গেলাম। আর তামীমা বানু মিশে গেলো মেয়েদের সঙ্গে..........

'পীরের ওখানে যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো, ওদের সঙ্গে এবং পীরের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশার কারণে পীরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা ইয়ার দোস্তদের মতো হয়ে গেলো। মনে হতো, তিনি পীর নন আর আমি মুরিদ নই।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, দাগী গুণ্ডা, বদ মায়েশ ও অপরাধীদেরকে পীর তার আস্তানায় আশ্রয় দেয়। অপরাধীদের জন্য এ জায়গাটা নিরাপদ.........

'তবে পীরের জিন হাজির করার কারামতকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করতাম। চার পাঁচবার আমি তার এই কামালিয়াত দেখেছি। প্রথমবার তো ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে ছিলো।

এক রাতে এক লোককে আনা হলো, তাকে জিনে ধরেছে। সঙ্গে তার পাঁচ সাতজন আত্মীয়ও ছিলো। পরে তাকে পীরের খাস বৈঠকে বসা হলো। জিনে ধরা লোকের আত্মীয়রা ও কয়েকজন মুরিদ সেখানে ফরশের ওপর বসা ছিলো। পীর বসা ছিলেন গালিচার ওপর। তার পেছনে উঁচু উঁচু মখমলের তাকিয়া।

প্রথমে পীর বিড় বিড় করে কি যেন পড়লেন। তারপর উঁচু আয়াজে বললো, 'এসো, এক্ষুনি এসো। আমি দেখতে চাই তুমি কে?'............

'চাপা ঝনঝনানির আওয়াজ উঠলো। আমি কামরার সব দিকে তাকালাম। সেখানে যারা ছিলো সবার মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। ঘুঙ্গুর ধ্বনির সঙ্গে এবার কারো কান্নার আওয়াজ শোনা গেলো।

একবার সন্দেহ হলো, শব্দ আসছে পীরের পেছন থেকে। আমি বসা ছিলাম, পীরের গদির তাকিয়ার পেছনে। তাই সবই দেখতেও পাচ্ছিলাম। যাকে জিনে ধরেছে সে হেচড়াতে হেচড়াতে একদিকে সরে গেলো। তার পুরো দেহ কাঁপতে লাগলো...........

পীর জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কোত্থেকে এসেছো?'– আওয়াজ এলো– 'ওর দোকানের ওপর আমার আস্তানা।'–

পীর জিজ্ঞেস করলেন– 'কী দোষ করেছে সে?'–

আওয়াজ এলো– সে আমার মাথার ওপর পা রেখেছিলো।–

পীর প্রশ্ন করছিলেন আর শূন্য থেকে এভাবে জবাব আসছিলো। এটা সবাই জানে, জিনরা যখন চলা ফেরা করে তখন নাকি ঘুঙ্গুর বাজার আওয়াজ হয়।

কামরায় ঘুঙ্গুর বাজার শব্দ হচ্ছিলো। তারপর পীর ঐ জিনে ধরা লোকের সঙ্গে এবং খোদ জিনের সঙ্গে কি আচরণ করেছিলেন সে এক লম্বা কাহিনী। এভাবে চার পাঁচবার জিনের শব্দের মুখোমুখি হয়েছি আমি.........

'এরপর তো আমি নিজেই জিন বনে গেলাম। পীরের খাস মুরিদদের মধ্যে আমার স্থান হয়ে গেলো। আমি নিজেই ঘুঙ্গুর বাজাতাম এবং জিনের ভাষায় কথা বলতাম।

আমার মতো বলশালী ও সাহসী লোকের প্রয়োজন ছিলো পীরের। তার কাছে এ ধরনের চারজন মুরিদ ছিলো। আমি হয়ে গেলাম পাঁচ নম্বর.........

'ভেদের কথা হলো, পীর যেখানে বসতেন, এর পেছনে একটি গর্ত খোদাই করা ছিলো। সেখানে বড়সড় একজন লোক বসতে পারতো অনায়াসে। সাক্ষাত প্রার্থীদের ঐ কামরায় ডাকার পূর্বে ঐ গর্তের ভেতর একজন গিয়ে বসে পড়তো। তখন গর্তের ওপর মোটা পাতের ঢাকনি দেয়া হতো।

এর ওপর বিছানো হতো গালিচা।

তারপর মুরিদ আর সাক্ষাতপ্রার্থীদের ভেতরে আসার অনুমতি মিলতো। পীর সাহেব যখন জিনকে ডাকতেন তখন গালিচার নিচ থেকে ঘুঙ্গুর বেজে উঠতো। আর সে লোক এমন শব্দে ও সুরে কথা বলতো যেটা পুরুস্বালী ও মেয়েলী কণ্ঠের মাঝামাঝি সুর হতো। আবার একটু নাঁকা নাঁকাও হতো.....

'এর আগে আমরা জিনে ধরা ব্যক্তিদের বাড়ি ঘর দেখে আসতাম। ঘরের লোক ক'জন, সে কি করে, ছেলে মেয়ে ক'জন, প্রত্যেকের ব্যাপারে যতটুকু জানা যায় ইত্যাদি জেনে আসতাম। তারপর সে অনুযায়ি কথা বলতাম। লোকে শুনে তো তাজ্জব হয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলতো। আরে এসব জানলো কোত্থেকে?..........

*** *** ***

'একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলি আমি। সারা ড্রামা তুমি বুঝতে পারবে। এক মহিলা তার স্বামীকে চাইতো না। আবার স্বামী থেকে তালাকও নিতে পারছিলো না। অর্থাৎ মহিলা সুন্দরী হওয়াতে স্বামী তাকে তালাক দিতে চাচ্ছিলো না। অন্য এক লোকের সঙ্গে মহিলার গোপন প্রেম ছিলো।

তিন বছর ধরে তাদের দাম্পত্য জীবন চলেছে এভাবেই। মহিলা পীরের কাছে এসে বললো, তাকে যেন এমন একটি তাবিজ দেয়া হয় যাতে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়.......

'পীর মহিলাকে তাবিজ না দিয়ে অন্য একটা সবক দিলো। সবক অনুযায়ি মহিলাকে জিনে ধরলো। মহিলা জিনে ধরার এমন অভিনয় করলো যে, স্বামী বাড়ির লোকেরা ভয়ে আতংকে পীরের কাছে দৌড়ে এসে, বললো ইয়া সরকার! আমাদের বউকে বাঁচান।

পীর তাদেরকে এটা তাবিজ ও কিছু আমল দিয়ে বিদায় করে দিলেন। ওদিকে মহিলাও পীরের সবক অনুযায়ী জিনে ধরা ছদ্মবেশ ধারণ করে অভিনয় চালিয়ে গেলো। অবশেষে তার স্বামীর বাড়ির লোকদের জানানো হলো, অমুক দিন জিনকে হাজির করা হবে.......

'তারপর পীরের খাস কামরায় জিনকে হাজির করা হলো। মহিলার স্বামী ও তার আত্মীয়স্বজনরা জিনের ঘুঙ্গুর বাজার গম্ভীর ধ্বনি শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলো। সেই জিন কে ছিলো জানো? আমি ছিলাম।

পীরের গালিচার নিচে বসে ঘুঙ্গুর বাজিয়ে বাজিয়ে এবং পীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হুমকি দিলাম, তার স্বামী যদি তাকে তালাক না দেয় তার পুরো বংশ ধ্বংস করে দেবো। তারপর ওকে আমি নিজেই বিয়ে করে ফেলবো........

'গ্রামের লোকেরা আজ শিক্ষিত হয়েও এসব ভাওতাবাজিতে বিশ্বাস করে। আর তখনকার দিনে গ্রামে তা দূরের কথা শহরেও শিক্ষিত লোকজন খুঁজে পাওয়া যেতো না।

পরদিনই ঐ মহিলার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিলো। পীরও তার কাছ থেকে মোটা টাকার বখশিস আদায় করে নিলেন ....

'পীরের এক ছেলে ছিলো। লোকেরা বাপের মতোই ছেলেকে মান্য করতো। কিন্তু বাপ বেটার মধ্যে সম্পর্ক ছিলো খুব খারাপ। এর কারণ হলো, বিশ একুশ বছরের পীরের এক বউ ছিলো। পীরের ছেলের সমবয়সী।

পীরের নিজের ছেলে ও স্ত্রীর ওপর সন্দেহ ছিলো। সন্দেহ বেঠিকও ছিলো না। কিন্তু বাপ তো এসব নিয়ে উচ্চ বাচ্চও করতে পারতো না। আর তারাও জানতো, পীরের পীরাকীর দূর কতদুর।

একদিন পীরের কয়েকজন চ্যালা এক হিন্দু যুবতীকে উঠিয়ে আনে এবং রাতে রাতেই পীর তার কাজ শেষ করে মুরিদদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। মুরিদরা তাকে যেখান থেকে উঠিয়ে এনেছিলো সেখানে রেখে আসে। এ ঘটনা ছেলে ও পীরের যুবতী স্ত্রী জানতো। ....

'আমরা গুপ্তচরের মতো মুরিদদের ঘরের নানান টুকিটাকি ব্যপারও জেনে এসে পীরকে জানাতাম। আমাদের বাতলানো সংবাদ অনুযায়ী পীর তাদেরকে

গায়েবের কথা জানিয়ে দিতো। মুরিদরা হয়রান হয়ে যেতো, পীরজি তাদের ঘরের গোপন থেকে গোপন কথাও জেনে ফেলেছেন। ......

'পীর আমাদেরকে বিনিময়ে অনেক কিছু দিতো। লোকেরা তার সামনে সিজদা করতো। সন্তানহীন মহিলারা তার কাছে সন্তান নিতে আসতো। আবার পীরের বাপের মাজারে বড় বড় সিন্নী দিতো। সিন্নীর পয়সা চলে যেতো পীরের পকেটে। কিন্তু লোকেরা জানতো না আসল পীর ছিলাম আমার পাঁচজন.......

'ওহ! তামীমার কথায় আসি। এর মধ্যে তামীমা গম ক্ষেতের পাশে আমার সঙ্গে আরো কয়েখবার দেখা করে। একবার সরাসরি বলে দেয়, সে আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু তামীমা বিবাহিতা ছিলো। স্বামীর ঘরে পাঁচ মাসের বেশি থাকতে পারেনি।

জাতপাতের ছোট খাট বিষয় নিয়ে বিরোধ শুরু হয় ছেলে ও মেয়ে পক্ষের মধ্যে। তামীমার মা বাবাও নিজেদের উঁচু নাক নিয়ে বসে থাকে। ছেলের মা বাবাও বলে দেয়, মেয়ের মান রাখতে চাইলে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর নিজেদের মান নিয়ে পড়ে থাকতে চাইলে মেয়েকে ঘরে বসিয়ে রাখো.......

'কিন্তু তামীমা বাপের বাড়িতে বসে থাকতে রাজী নয়। সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইতো যে কোন বিনিময়ে। কিন্তু ওর মা বাবা তা হতে দেবে না। একবার সে খুব জিদ করলো। তখন মা বাবা দু'জনে মিলে ওকে মারপিট করে। তারপর থেকে তামীমা চুপচাপ হয়ে যায়।

তবে একবার লুকিয়ে স্বামীকে চিঠি লিখে যে, তোমার ভেতর যদি পৌরষত্ব থাকে আমাকে এসে নিয়ে যাও। স্বামী জবাব দেয়, আমি এত আত্মসম্মানহীন পুরুষ নই। তোমার বাপকে বলো, আমাদের বাড়িতে এসে তোমাকে রেখে যেতে। মীমাংসার সম্ভবনা ছিলো না এ কেবারেই........

মা বাবার চাপে স্বামী তামীমাকে তালাকও দেয়ার হুমকি দেয়।

তামীমার প্রস্তাব নিয়ে দু' দণ্ড ভাববার মতো স্থিরতা ছিলো না আমার। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর ডাকে সাড়া দিলাম। তারপর থেকে তার একই বুলি, চলো কোথাও পালিয়ে যাই। সে তো উঁচু জাতের আমীর ঘরনার মেয়ে। আমি ওকে নিয়ে যাবো কোথায়?

একদিন বললো, আমি অনেক অলংকার ও নগদ টাকা পয়সা নিয়ে আসবো। তখন আমরা পালাবো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম সেদিন। আরেকদিন মাজারে এসে বললো–

'আমি চলে এসেছি আর ফিরে যাবো না।'

সে তার বাড়ি থেকে মাজারে সালাম করার কথা বলে এসেছে। আমি ওকে বাড়ি ফিরে যেতে বললাম। কিন্তু ও বেকে বসলো। সে জানালো, আজ ওর মা বাবা ওকে খুব মেরেছে। ওর স্বামীর কথা বলতেই ওরা ওকে এভাবে মেরেছে.........

'বলো, এমন অত্যাচার আর কতদিন সইবো?'– সে বললো।

ঘর থেকে সে নগদ টাকা পয়সা আর স্বর্ণালংকারও নিয়ে এসেছে। আমার আঁতে ঘা দিয়ে বললো,–

'তোমাকে আমি কিন্তু সাহসী পুরুষ বলে জানি। মেয়েদের মতো ভীতু হয়ে পিঠ দেখাবে না'–

আমি ওকে বললাম, দেখো আমি কামিন জাতের ছেলে, আর তুমি অনেক উঁচু জাতের মেয়ে, তুমি কি আমার সাথে থাকতে পারবে?

সে বললো– 'তোমার চেয়ে উঁচু কেউ নেই'–

সে আরো এমন কিছু কথা বললো, আমার পৌরুষ জেগে উঠলো..........

*** *** ***

'ওকে বললাম, তুমি মাজারে যাও। সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি পীরের কাছে গিয়ে সারা বৃত্তান্ত শোনালাম। বললাম, তামীমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। পীর যখন শুনলো, মেয়ে অমুক ঘরের। ঘাবড়ে গেলো পীর। বলতে লাগলো–

'তুমি তো মিয়া কামিন জাতের ছেলে। আর ও বড় চৌধুরীর মেয়ে। যদি ধরা পড়ো, ওরা তোমাকে কেটে কুকুর দিয়ে গোশত খাওয়াবে। ওকে ফিরিয়ে দাও।'–

আমি বললাম, তিন চারদিন তামীমাকে এখানে রাখবো এবং এ কয়দিনে ভেবে বের করবো কি করা যায়। জিন ভূতের নাটাই খেলবো, না অন্য কোথাও চলে যাবো।

পীর আমাকে উপদেশ দিলো,

কারো মেয়েকে এভাবে লুকিয়ে রাখা খুব খারাপ কাজ। ফিরিয়ে দিয়ে এসো। পীরকে আমি বললাম–

'আপনার জন্য আমি এর চেয়ে খারাপ কাজ করছি। এই মেয়েকে কোন মূল্যেই হাতছাড়া করবো না। বিয়ে করে ওকে আমার জন্য বৈধ করে নেবো।

পীরের শাহরগ তো ছিলো আমাদেরই হাতে। পীর মেনে নিলো আমার কথা। বললো, যাও মেয়েকে নিয়ে এসো......

'মাজারে গিয়ে তামীমাকে বললাম, আমার পেছন পেছন এসো। পীরের কাছে যখন ও পৌছলো, ওকে দেখে পীরের চোখ ট্যারা হয়ে গেলো। যেন এ ধরনের বস্তু সে আর কোন দিন দেখেনি।

পীরের কুৎসিত আবেগ উছলে উঠলো। বলে উঠলো–

'তোমরা আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছো। তোমাদের দু'জনকে আমি আমার বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখবো। এবং নিজ হাতে তোমাদের বিয়ে পড়াবো.....

'পীর তার কথা রাখলো। পীরের বাড়িটি বিশাল ছিলো। আমাকে এমন একটি কামরা দেয়া হলো যেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ যাবে না। পরদিন আমাদের বিয়ে পরিয়ে দিলো। কালেমা পড়িয়ে নিজেই সাক্ষী হলো। নিজেই কাজী হলো.....

যদি জিজ্ঞেস করো, আমার পরবর্তী পরিকল্পনা কি ছিলো? তোমাকে জবাব দিতে পারবো না আমি। তখন ছিলো উন্মুক্ত যৌবনের তাপ। তামীমার প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসার তীব্রতা আমাকে চিঁতার শক্তি আর সাহস দিয়েছিলো। কিন্তু বুদ্ধির ঘর ছিলো অন্ধকার।

আমার ভাবনা বলো চিন্তা বলো একটাই ছিলো। এত বড় ঘরের এমন সুন্দরী মেয়ে আমার জন্য ঘর ছেড়ে চলে এসেছে, আর আমার মতো এমন বীর যুবক তাকে উপেক্ষা করবে! তাছাড়া পীর আমার মনোবল এই বলে আরো বাড়িয়ে দিলো যে–

'চিন্তা করো না, আরামে থাকো, এখানে তোমাদেরকে জিনও দেখতে পাবে না'......

'পরদিনই তামীমার মা পীরের কাছে এসে হাজির। আমরা তো জানতামই কেন এসেছে মহিলা। পীরকে এসে জানালো, তার মেয়ের স্বামী আত্মহত্যা করেছে। তামীমাকে তার পূর্ব স্বামীর আত্মহত্যার খবর জানালাম আমি। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার।

ঘটনা দুঃখজনক হলেও আমি একটু ভারমুক্ত হলাম যে, এই মেয়ে আমার জন্য এখন সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে গেছে।

পরে পীর আমাকে বলেছিলো, তামীমার মা এই প্রার্থনা নিয়ে আসে যে, জিনদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমার মেয়ে কোথায় আছে? পীর মহিলাকে

বলেছিলো, এখনো জানা যায়নি কোথায় গেছে। শুধু এতটুকু জানা গেছে যে, সে নিজ ইচ্ছায় গিয়েছে। একাধারে পাঁচ ছয় দিন মহিলা পীরের দরবারে হাজিরা দিলো......

*** *** ***

'তামীমাকে আমি এ কয়দিন লুকিয়ে রাখলাম। সাত দিনের দিন তো কেয়ামত এসে গেলো। ঘুম থেকে উঠেই শুনি পীর তার কামরায় মরে পড়ে আছে। আমি গিয়ে লাশ দেখলাম।

চিত হয়ে পীর পড়ে আছে সে কামরায় যেখানে জিনদের হাজির করা হতো। চোখ দুটি খোলা।

আগুনের মতো সারা এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়লো, তাদের পীর মুরশিদ কতল হয়ে গেছে। মুরিদরা পিল পিল করে তার আস্তানার দিকে আসতে লাগলো। হাজারো মুরিদ জমা হয়ে গেলো অল্প সময়ের মধ্যে। দেখলাম সবাই ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। মেয়েরাও কাঁদছে চিৎকার করে........

'আমার ভয় হলো, তামীমাকে না আবার কেউ দেখে ফেলে। তাই যে কামরায় ওকে লুকিয়ে রেখেছিলাম সে কামরার বাইরে থেকে পুরনো একটি তালা ঝুলিয়ে দিলাম। কাঁদছিলো তো সবাই।

কিন্তু পীরের ছেলে ছিলো ব্যতিক্রম। তার চোখ দুটো ছিলো শুকনো। আরেকজন হলো পীরের ছোট স্ত্রী। সেজেগুজে আস্তানার এক কোনে শক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। পীরের ছেলে কয়েকবার লোকজনের ভিড়ে গিয়ে বলে আসলো, এ হলো জিনদের কারসাজি.........

'বেলা চড়ার আগেই পুলিশ এসে গেলো। পুলিশ অফিসারের কাছেও পীরের ছেলে বললো, আপনারা সময় নষ্ট করবেন না। তদন্ত করে কিছুই পাবেন না। কারণ, পীরদেরকে কোন মানুষ হত্যা করতে পারবে না। এটা জিনদের কাজ। আমার বাবার কব্জায় বড় বড় অবাধ্য জিন ছিলো। এ ধরনের কোন এক জিন কব্জা থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে......

'পুলিশ অফিসার ছিলো হিন্দু। সে অনেক জেরা করলো মুরিদদেরকে। ভেতরে পীরের ছেলের সঙ্গে অনেক্ষণ কাটালো। লাশ ভেতরেই ছিলো।

সবাই জানতো, লাশ পোষ্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু পীরের লাশের সঙ্গে কোন বেয়াদবীমূলক কিছু হবে এটা কেউ পছন্দ করছিলো না।

তারপরও পুলিশের দায়িত্ব তো পালন করতেই হতো। তিন চার ঘন্টা পর ইনস্পেক্টর বাইরে এলো এবং কনস্টেবলদের নিয়ে থানায় ফিরে গেলো......

'লাশ কামরায় খাটের ওপর শোয়ানো ছিলো। সেভাবেই পড়ে রইলো। ওদিকে পীরের ছেলে ঘোষণা করিয়ে দিলো, তার পিতার মৃত্যু জিনদের হাতে হয়েছে। মুরিদদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়লো।

পীরের ছেলে আরেকটা কাজ করলো। খাস মুরিদদের মাধ্যমে রটিয়ে দিলো যে, সে তার বাবার সমস্ত জিনকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে এবং তার বাবার ঘাতক জিনকে যেভাবেই হোক ধরে এনে হত্যা করা হবে......

'পীরের লাশকে আমি ও তার এক খাস মুরিদ মিলে গোসল দিলাম। কাফনও পরালাম। তারপর বড় শান শওকতের সঙ্গে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। যেখানে তার বাবা পীরের কবর সেখানেই তাকে দাফন করা হলো। এতে মাজারের মর্যাদা আরো বেড়ে গেলো। কারণ; এই মাজারে এখন দুই জন পীর কবরস্থ হয়েছে.........

'আমার আবার ভয় হলো, তামীমা না আবার ধরা পড়ে যায়। পীরের ছেলে এটা জানতো না যে, এই বাড়ির এক কামরায় আমি একটি মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছি। সে শুধু জানে, আমি ওর বাপের খাস মুরিদদের একজন ছিলাম। ছেলেরও এ ধরনের মুরিদের প্রয়োজন আছে।

সে আমাদেরকে তার ইয়ার বন্ধুদের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে তার বাপের বড় স্ত্রীকে পৃথক একটি বাড়ি দিয়ে দিলো। আর ছোট স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে রেখে দিলো। দু'জনই ছিলো তার সতালো মা।

ছোট স্ত্রী তার সমবয়সীই ছিলো। একে নিয়ে বাপ বেটার মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ ছিলো। ছোট স্ত্রী নিজেই পীরের ছেলেকে পছন্দ করতো। তা ছাড়া পীরজাদা তখনো বিয়ে করেনি........

'যা হোক একদিন আমি ওকে বলে দিলাম, তাদের বাড়ির এক কামরায় তার বাপের অনুমতিতে এক মেয়েক লুকিয়ে রেখেছি। সে মেয়ে আমার জন্য ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। তখন তার বাপ আমাদের বিয়ে পরিয়ে দিয়েছে। পীরজাদা মেয়ে দেখতে চাইলো। আমি তাকে সে কামরায় নিয়ে গেলাম। তামীমাকে দেখে তার মুখের হাসি চওড়া হয়ে গেলো।

বললো- আরে কামিন! এই তোমার ভাগ্য? এতো এই গদির বরকত। আমাদের খেদমত করে যাও এবং আয়েশও করে যাও আরো বেশি করে।'-

তামীমার মাথা ও গালে হাত বুলিয়ে দিলো এবং আমার দিকে আজব চোখে তাকিয়ে রইলো........

'তামীমা খুব ঘাবড়ে গেলো। আমার দু'হাত খামচে ধরে বললো, এখানে আর একদিনও থাকা ঠিক হবে না। এতো এর বাপের চেয়ে বড় বদমায়েশ মনে হয়। পীরজাদা সেদিনই তার মনের বদমায়েশি রূপ দেখিয়ে দিলো।

জোয়ান হওয়াতে বাপের চেয়ে বেপরোয়াও ছিলো বেশি। তাছাড়া সারা এলাকার লোকেরা তাকে পীর বলে মেনে নিয়েছে।

সে আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললো– 'ঐ মেয়েদের বাড়িতো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ওদের সারা খান্দান আমাদের মুরিদ। ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু মেয়ের হাওয়াও আমরা বাইরে যেতে দেবো না। ভয় পেয়ো না, শুধু এটা খেয়াল রাখবে যে, ওকে শুধু নিজের বউ মনে করো না। তোমার পীর মুরশিদের দিকেও খেয়াল রেখো'.......

'মাথায় আমার আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু আমি নিজেকে কঠিনভাবে শাসন করলাম। বহু কষ্টে শান্ত রাখলাম নিজেকে। আর পীরজাদার সামনে বিগলিত হয়ে বললাম,

'আমরা সরকারের মাজারের গোলাম। এমন কথা বলারই বা কি প্রয়োজন। আমার সবকিছুই আপনার জন্য উন্মুক্ত।'

সে খুব খুশি হলো। তাকে বললাম, আমার কিছু টাকা-পয়সা দরকার। এই বলে দু'শ টাকা চাইলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলো। তখন দু'শ অনেক টাকা। বড় বড় সরকারি অফিসারের বেতনই ছিলো ত্রিশ টাকার নিচে। তামীমার কাছেও বেশ কিছু টাকা ছিলো......

'রাতে যখন পীরজাদা শরাব খেয়ে মাতাল হয়ে তার ছোট সতালো মায়ের ঘরে চলে গেলো। খাস মুরিদরাও যার যার ডেরায় ফিরে গেলো, তামীমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। এমন এক সফরে বেরিয়ে পড়লাম যার মনযিল জানা ছিলো না আমার।

এখন তো আমরা দু'জনই সবার চোখে আসামী। মনযিল তাই মৃত্যুও হতে পারে। ছিলাম আমি গোঁয়ার –গ্রাম্য। দেহাতের বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই জানতমা না। আমরা পায়দল যাচ্ছিলাম রেল স্টেশনের দিকে। সেখান থেকে চার মাইল দূরে রেল ষ্টেশন। চাঁদনী রাত ছিলো । ক্ষেত খামারের ভেতর দিয়ে পথ করে চলছিলাম আমরা........

'কয়েকবার আমি পিছন ফিরে তাকালাম। মাজারের গম্বুজটি চোখে পড়লো আমার। বহু দূর থেকে সেটি দেখা যায়। মানুষ তো একে কা'বা শরীফ মনে করে। একে সিজদা করে। মান্নত মানে। সিন্নী করে।

কে তাদেরকে বলবে, এ গদি আসলে বদকারদের নোংরা আড্ডা। এখানে কারো বোন, মেয়ে ও স্ত্রীর আবরু নিরাপদ থাকে না। এখানে কোন জিনও বন্দি নেই। কয়েকজন খাস মুরিদই এখানকার জিন।

পীরকে কোন জিন হত্যা করেনি। হত্যা করেছে কোন মানুষ। ভেবে দেখো তো, যদি লোকদেরকে বলে দিতাম, আসল জিন আমি ও আমার চার সঙ্গী। তাহলে কি কেউ এটা বিশ্বাস করতো? তুমি লোকদেরকে আমার কাহিনী শুনিয়ে দেখো, বলবে, ভূয়া গপ্পবাজ লোক.......

*** *** ***

'যুগ আজ কত উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকেরা আজো পীরের পায়ে সিজদা করে। এখনো মাজারে গিয়ে মাথা ঠুকে। তাদের স্ত্রী, বোন, মেয়েরা পীরের খাস কামরায় গিয়ে নিজেদেরকে নযরানা হিসেবে পেশ করে.......

'যে মাজারে সালাম করার জন্য লোকেরা লম্বা লম্বা সফর করে আসে, সেই মাজারের ওপর শত অভিশাপ দিয়ে আমি আরো ভয়ংকর সফরে বের হয়ে পড়েছি। আমার আসল পীর মুরশিদ তো ছিলো আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর পবিত্র জাত। অন্তরে তাদের নামই স্মরণ করছিলাম।

আমিও পাপ করেছিলাম। একেবারে নিস্পাপ ছিলাম না। তামীমার স্বামী জীবিত থাকতে ওকে আমি বিয়ে করি। অথচ তার স্বামী তাকে তালাকও দেয়নি।

আমার মূর্খ মাথায় একবার একথাও এলো না যে, তামীমাকে নিয়ে আমি ওদের গ্রামে যাই। সবার সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে উঠি, এই যে দেখে নাও তোমাদের ইযযত, অহংকার, জাতপাতের রাজনীতিকে এক কামিনের পায়ে আছড়ে ফেলেছে।

ঐ উঁচু জাতের ভূরি ওয়ালারা তো একেই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব মনে করে যে, নিজের স্বামীর বাড়ি থেকে মেয়েকে এনে ঘরে বসিয়ে রাখা। আর স্বামীও শ্বশুরালয় থেকে স্ত্রীকে উঠিয়ে আনাকে নিজের বেইজ্জতি মনে করে......

'আরো বলতাম, তোমরা তার দেহ মন আর যৌবনের দিকে তাকাওনি। তাকিয়েছো নিজেদের মিথ্যা অহংকারের দিকে। এ কারণে মেয়ে মনের ও দেহের তৃষ্ণা মেটাতে তার পছন্দ মতো একজনকে বেছে নিয়েছে......

'কত চিন্তা যে মাথায় এলো। সবই উদ্ভট চিন্তা। নিজের পরিণাম সম্পর্কে তো জ্ঞানই ছিলো না। খোদার কাছে আমি মাফ চাইলাম। তার কাছে সাহায্য চাইলাম। একটু কান্নাও করলাম মুখ লুকিয়ে। তামীমা বুঝতে পারেনি।

মোটেও আশা করিনি খোদা আমাকে মাফ করবেন। কারণ, আমি জানতাম কত বড় পাপী ছিলাম আমি। জেনে শুনে পাপ করে ছিলাম আমি..........

'তারপরও ভরসা ছিলো ঐ মহান সত্ত্বার ওপরেই। রাত থাকতেই আমরা ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তামীমা মুখ ঢেকে রেখেছিলো চাদর দিয়ে। আমি মাথা মুখ চাদর দিয়ে আবৃত রেখেছিলাম।

কোথায় গেলে সুবিধা হবে তা তো জানতাম না। তামীমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো– দিল্লির টিকেট কেটে ফেলো'।–

দিল্লি তো আমিও চিনি না, তামীমাও না। কখনো কেউ দিল্লি যাইনি আমরা। আসল কাজ হলো এখন যত দূরে চলে যাওয়া যায়। এখানে বসে থাকাটা বিপজ্জনক।

তাছাড়া আমরা মনে করতাম, দিল্লির চেয়ে দূরের আর কোন জায়গা নেই। শুধু জানতাম দিল্লি মুসলমানদের শহর। কি কারণে জানি আমারও মনে হলো দিল্লি ছাড়া আর কোথাও আমাদের আশ্রয় মিলবে না.......

'গাড়ি পৌঁছতে এখনো দু' ঘন্টা বাকি আছে। অন্ধকার এক কোনে গিয়ে আমরা বসে পড়লাম। তামীমা এখন আমার চেয়ে অনেক সাহসী মেয়ে। আমাকে এটা সেটা বলে সাহস বাড়াতে লাগলো।

দিল্লিতে কিভাবে যাওয়া যায়, কি করে দিল্লি চিনবো এক ফাঁকে এটা জিজ্ঞেস করে নিলাম এক লোকের কাছ থেকে। চিন্তিত ছিলাম পথে আবার গাড়ি পাল্টাতে হয় কিনা।

লোকটি জানালো, চিন্তা নেই এই গাড়ি সোজা দিল্লি যাবে, পরদিন দুপুরে গিয়ে পৌঁছবে।...... গাড়ির সময় হলে দু'টি টিকেট কেটে নিয়ে এলাম। তখন গাড়িতে এত ভিড় হতো না। বিশেষ করে রাতে গাড়ির কম্পার্টমেন্ট খালি যেতো। আমরা নিরালা একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লাম......

'গাড়ি আমাদেরকে এক বিপদ থেকে উদ্ধার করে অজানা এক গন্তব্যের দিকে নিয়ে চললো। যে গন্তব্য সম্পর্কে কোন জ্ঞাণই ছিলো না। অজানা সেই দেশে পৌঁছে গেলাম। গাড়িতে আর কোন ধরনের ঝামেলা হয়নি।

এত বড় স্টেশন দেখে তো আরো ঘাবড়ে গেলাম। মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। যে দেশের রেল স্টেশন এত বড় সে দেশটা না জানি কত বড়।

এত বড় শহরে আমরা কোথায় যাবো, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করলেন। স্টেশনে দাঁড়িয়ে দুই আনাড়ী যুবক যুবতী যখন কোথায় যাবো না যাবো এই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম, তখনই আল্লাহর এক বান্দা এগিয়ে এলো........

*** *** ***

'এ যেন আল্লাহর পাঠানো ফেরেশতা। আমাকে দেখে হয়তো আচ করে নিয়েছিলো, এরা এই শহরে নতুন এবং অসহায়। আর আমার বউ তামীমাকে দেখে হয়তো আশংকা করেছে এত সুন্দরী মেয়েকে এই লোক এত বড় শহরে বড় বিপদে পড়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না।

লোকটি নেক দিলের মানুষ ছিলো। আমি তাকে বললাম, রোজগারের তালাশে দিল্লিতে এসেছি। জানি না, লোকটির মনে কেন এ সন্দেহ জাগলো না যে, আমি কোন সন্দেভাজন লোকও হতে পারি।

আর এ মেয়ে আমার স্ত্রীও না হতে পারে। লোকটি আমাদেরকে তার বিরাট বাংলোয় নিয়ে গেলো। বাংলোটির মালিকদের সামনে আমাদের হাজির করলো। বড় বড় দুটি বাগান আছে সে লোকের। মহিষও আছে গোটা কয়েক......

'তার এ ধরনের লোকের প্রয়োজন ছিলো, যে তার বাগান আরো সুন্দর করে গড়ে তুলবে এবং মহিষগুলোরও রাখালি করবে। আগে যেসব মালি ও নওকর ছিলো তারা হয় পালিয়ে গেছে না হয় কাজ না বোঝার কারণে বাদ পড়েছে। আমি দেহাতী বলে আমাকে পছন্দ করলো মালিক। বাংলোর সঙ্গে আমাদেরকে দু' রোমের কোয়ার্টারও দিয়ে দিলো...........

'আজো যখন সেই স্মৃতির পাতা উল্টে দেখি। আমার কাছে মনে হয় এসব কিছুই ঘটেনি। অনেক দিন ধরে আমি কল্পনার জগতে স্বপ্নের রঙ্গীন পাতা দিয়ে সাজিয়েছি এসব।

এতো এক ধরনের কারামতই ছিলো, পরদেশে পা রাখলো একজন লোক আর তাকে আরেকজন এমনভাবে আশ্রয় দিলো যেন খোদা তাকে আমার অপেক্ষায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো। কোন পূণ্য কাজের পুরস্কার খোদা দিয়েছিলেন এটা? এমন কোন পূণ্যের কথা তো আমার স্মরণে পড়ে না। আমি তো পাক্কা পাপী ছিলাম। তার ওপর ছিলাম কামিন –নিকৃষ্ট জাতের ইতর লোক......

'বাগানের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম আমরা। আর মহান আল্লাহর দরবারে মাথা ঝুকিয়ে দিলাম। তাছাড়া যেহেতু সেখান থেকে আমাদের আর পালানোর

প্রয়োজন ছিলো না, আমরা পালিয়ে কোথাও যেতেও পারতাম না; তাই মন প্রাণে ঢেলে দিলাম বাগানের পেছনে। দু'জনে মিলে বাগানটাকে দারুণ সুফলা করে তুললাম।

এ যেন আমাদের নতুন জীবনের চ্যালেঞ্জ। অল্প দিনের মধ্যেই ফল ফলাদি ও সবজির এত প্রচুর ফলন শুরু হলো যে, প্রতিদিন আমি কয়েক গাড়ি সব্জি ফল বাজারে নিয়ে যেতাম আর মুঠি মুঠি পয়সা নিয়ে ফিরে আসতাম। সঙ্গেসঙ্গে যত্নআত্নি করে মহিষগুলোকে তাজা করে তুললাম.......

'মালিক তো দারুন খুশি আমাদের কাজে। যেমন অভিজাত বংশের ছিলো তারা, তেমনি ভদ্র ও সজ্জনও ছিলো। আমাদের দু'জনের সরল নিয়ত ও কঠোর পরিশ্রম দেখে তাদের পরিবারের মধ্যে আমাদেরকে গণ্য করে নিলো। আমরা শুধু নামকাওয়াস্তে ছিলাম নওকর।

তামীমার শুধু রূপই ছিলো না। বাইরের রূপের মতো ভেতরটাও ছিলো রূপময়– দারুণ কোমল। হাজারো খেটে মুখে ভুবন ভুলানো হাসিটা ঠিকই ধরে রাখতে পারতো।

মালিকের পরিবারের নারী মহলে তামীমা হয়ে উঠলো সবার নয়নের মনি। মালিকের স্ত্রী বলো, আমার মেয়ে বলো, অন্যকোন আত্মীয় স্বজন বলো, তামীমার নামে সবাই পাগল। তামীমাকে ছাড়া তাদের কোন গল্পের আসরই জমে না........

'একটু চিন্তা করে দেখো তো, এতবড় ঘরনীর মেয়ে। অথচ সাধারণ এক কামিনের ভালোবাসার টানে নওকরের জীবন বেছে নিয়েছে। নিজেও কামিন বনে গেছে। তারপরও বাধ্য হয়ে নয়, হাসি মুখে।

কোন অনুযোগ করেনি কোন খাটুনির জন্য। অভিমান করেনি এই জীবনের জন্য। এদের সঙ্গে আমরা এমনভাবেই মিশলাম যে, তামীমা গল্পে গল্পে আমাদের ফেলে আসা অতীত কাহিনী শুনিয়ে দিলো........

'এভাবে দুই বছর পার হয়ে গেলো।'

বাংলোর মালিক আমাকে ডেকে বললো, ঘর থেকে জানতে পেরেছি, তোমার স্ত্রী এক আমীর পরিবারের মেয়ে। আশ্চর্য, এমন উঁচু ঘরের মেয়ে কি করে এত কষ্টের কাজ করে যাচ্ছে। সত্যিই না দেখলে বিশ্বাস হতো না।

আমি আর বাকি কথা লুকানোটা ভালো মনে করলাম না। তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলাম। তামীমা ওদেরকে যা শোনায়নি তাও শুনিয়ে দিলাম। বাদ পড়লো না পীরের কথাও। পীরের আসল রূপ, তার কারসাজি তাও বললাম।

পীরের ছোট স্ত্রীর সঙ্গে তার ছেলের অবৈধ সম্পর্ক এবং এ নিয়ে পরবর্তীতে পীরকে হত্যার কাহিনীও শোনালাম।

এও শোনালাম, হত্যার পর পীরজাদা পুলিশের সঙ্গে মিলে তার বাপের হত্যার আসল কারণ লুকিয়েছিলো। তারপর সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় যে, তাকে জিনেরা হত্যা করেছে। অথচ পীরের কব্জায় কোন জিনটিন ছিলো না। জিন থাকলে ছিলাম আমরা পাঁচ গুনাহগার।

আমি অবশ্যই হত্যাকারী কে– তা জানি। কিন্তু বাংলোর মালিককে সেটা বলিনি।'

*** *** ***

চাচা মাজেদকে আমি এখানে থামিয়ে দিলাম। বললাম– 'আপনি না বললেও এটা তো পরিষ্কার যে, পীরের ঘাতক তার ছেলে।'

চাচা মাজেদ শব্দ করে হেসে উঠলো। এবং বললেন– 'হাজী সাহেব (বাংলোর মালিক)-ও একথা বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, পীরের ছোট স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য ও গদিনেসীন হওয়ার লোভে পীরজাদাই তাকে হত্যা করেছে। পীরজাদা ইনস্পেক্টরকে ঘুষ দিয়ে থানায় এটা প্রমাণ করেছে যে, পীরকে হত্যা করেছে জিনেরা।

আমি হাজী সাহেবকে বলেছিলাম, আমারও তাই মনে হয়। অথচ ঘাতক পীরজাদা তো ছিলোই না, কোন জিনও ঘাতক ছিলো না।'

'তাহলে কে ছিলো হত্যাকারী?'– হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি ছাড়া আর কে হতে পারে? পীরকে আমি নিজ হাতে হত্যা করেছি'– চাচা মাজেদ বললেন নির্বিকার কণ্ঠে।

আমি চমকে উঠলাম। অবিশ্বাস্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চাচা মাজেদের বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেলো। তিনি বলে উঠলেন–

'আজ প্রথমবারের মতো এই রহস্যভার আমার বুক থেকে বেরিয়ে এলো। আল্লাহর পর এতদিন আমার স্ত্রীই একথা জানতো। আজ অতীত ঘাটতে ঘাটতে স্মৃতির তরী এমনভাবে দুলে উঠলো যে, গোপানীয়তার অতলান্ত থেকে এই রহস্য বেরিয়ে এলো। অর্ধ শতাব্দী আগের এক পবিত্র নিষ্পাপ হত্যা এতদিন যেন ভেতরে হৃদয়ের কাঁটা হয়ে ছিলো। আজ প্রথম সেই কাঁটা আমি টেনে বের করলাম।'

'আচ্ছা! কতল করেছিলেন কিভাবে?'

'তুমি তো দেখি কাহিনীর মাঝখান থেকে ভুলে গেছো'– তিনি বললেন– মনে করে দেখো, তামীমা আমার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এবং যখন পীরের কাছে গিয়ে আমি আশ্রয় চাইলাম পীর আমাকে ভয় দেখালো, ধরা পড়লে এই এই অসুবিধা হবে। ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। আমি উল্টো হুমকি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলাম।

যা হোক, পরে পীর তামীমাকে দেখে মনে মনে উন্মাদ হয়ে উঠলো। ভালো এক শিকার পাওয়া গেছে। পীর বললো, আমাদেরকে তার বুকে আশ্রয় দেবে........

'নিজেই সে আমাদের বিয়ে পরিয়ে দিলো। তখনই পীরের নিয়ত আঁচ করতে পারলাম। তামীমাকে এখানে এনেই আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে কোথায় যাবো? পাঁচ ছয় দিন এভাবেই কেটে গেলো।

সপ্তম দিনের রাতে পীর আমাকে একটা কাজে বাইরে পাঠালো। কাজটা এমন ছিলো যে, সারা রাত আমাকে বাইরে কাটাতে হবে। আমি চলে গেলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর খচ করে মনে একটা কথা জাগলো যে, পীর তো এ কাজে আমাকে দিনেও পাঠাতে পারতো। রাতে কেন পাঠালো?

আমার সন্দেহ হলো, যে কোন কারণেই হোক, পীর আমাকে অনুপস্থিতে রাখতে চাইছে। আমি সেখান থেকেই দৌড় শুরু করলাম.......

'আমি হাঁপাতে হাঁপাতে আমাদের কামরায় গেলাম। কামরার দরজা নক করে খোলা পেলাম। তামীমা কামরায় নেই। সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়ে গেলো। তামীমাকে খুঁজতে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম।

তখনই পীরের জিন হাজির করা কামরা থেকে নারী কণ্ঠ পেলাম। দরজা ধাক্কা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজার আড় খুলে গেলো। কামরায় একটি ছোট ল্যাম্প জলছিলো।

পীর তামীমাকে জাপ্টে ধরে রেখেছিলো আর মুখে তার নাপাক মুখ ঘষতে চেষ্টা করছিলো। তামীমা তাকে গাল দিচ্ছিলো আর তার বন্ধমুক্ত হতে চেষ্টা করছিলো।

পরে তামীমা বলে ছিলো, পীর তাকে কোন এক বাহানা দিয়ে সে কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো........

'পীরের পিরাকী যে কোন পর্যন্ত তা তো আমি জানতামই। এ দৃশ্য যেন আমার ভেতর অগ্নিয়গিরি ফাটিয়ে দিলো। ক্রোধ আমাকে করে দিলো অন্ধ। তার ওপর আমি হামলে পড়লাম। পেছন থেকে পীরের ঘাড় দু'হাতে চেপে ধরলাম।

ঘাড়ে এত জোরে কোপ বসালাম যে, পীরের বাহুবন্ধন থেকে তামীমা সহজেই বেরিয়ে গেলো। আমি ঘাড় ছাড়লাম না।

আমার দেহে তখন পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মতো শক্তি। আমার হাতের চাপ আরো বেড়ে গেলো। পীর একবার ছটফট করে উঠলো। তারপর নাক দিয়ে ঠুস করে বাতাস ছেড়ে দিলো। তখন তার দেহ কেমন ঢিলে হয়ে গেলো। যখন ছেড়ে দিলাম তখন পীর পড়ে গেলো..........

*** *** ***

'তখনই বেটাকে আযরাঈল (আ) এসে জাহান্নামে নিয়ে গেছে সেটা আমি বুঝতে পারিনি। তামীমাকে নিয়ে আমাদের কামরায় চলে এলাম। তামীমা খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলো। সে বলতে লাগলো, পীর তো এর প্রতিশোধ নেবে। তার কজায় জিন আছে।

আমি তাকে বললাম, সে পীরও নয় এবং তার কাছে কোন জিনটিনও নেই। তোমার সঙ্গে যা করতে চেয়েছিলো সে সেটাই। অর্থাৎ বড় লম্পট ও বদমায়েশ। সকালে তার সঙ্গে কথা বলেই এখান থেকে বের হবো। দৈহিক শক্তি, যৌবনের উত্তাপ আর প্রচণ্ড সাহস আমাকে বেপোরোয়া করে তুললো। রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দিলাম।

সকালে আমার চোখ খুললো এই আওয়াজে– 'সরকার মারা গেছেন..... লাশ ফরশের ওপর পড়ে আছে......

আমি গিয়ে দেখলাম। রাতে যেভাবে রেখে এসেছিলাম পীর সেভাবে পড়ে আছে। বুঝলাম আমার হাতেই সে মারা গেছে। তাহলে তো জিনের হাতেই মারা গেছে। কারণ, আমি তার পাঁচ জিনের এক জিন।

ভয়ও পেলাম। ভয়ে ঘাম ছুটে গেলো আমার। তামীমার তো কাঁপুনি এসে গেলো। তখন আমাদের পালানোর পথও বন্ধ। কারণ, এ অবস্থায় পালালে ধরা পড়লে ঘাতক হিসেবে প্রথম সন্দেহভাজন আমরা হতাম। এর মধ্যে পীরের ছেলে রটিয়ে দিলো, এটা জিনদের কাণ্ড। ....

তুমি হয়তো আশ্চর্য হচ্ছো, পীরের ছেলে কেন এমন করলো?

বাপ বেটার মধ্যে তো আগ থেকেই শত্রুতা ছিলো। তারপর বাপের গদির ওপরও ছেলের লোভ কম ছিলো না। সাধারণ মুরিদরা তো এটা জানতো না। পীরজাদা যেদিকেই যেতো তার সামনে সিজদায় পড়ে যেতো লোকে.....

এটা শুধু জানতাম আমরা পাঁচ জিনের দল। পীরজাদা বাপের লাশ দেখে খুশিই হলো। সে এ থেকে ফায়দা উঠালো যে, সাধারণ মানুষের মনে এই ভয় ঢুকিয়ে দিলো, এই গদির দায়িত্বে বড় বড় ভয়ংকর জিনের দল আছে। লোকদেরকে এটাও বিশ্বাস করাতে পেরেছিলো যে, কোন পীরকে কোন মানুষ কখনো হত্যা করতে পারবে না।

হয় স্বাভাবিক মৃত্যু, না হয় জিনরা হত্যা করবে। পুলিশ অফিসারকে থলে ভরে ঘুষ দেয় সে। হত্যার ঘটনা থানার কাগজেই উঠতে দেয়নি।

তারপর ঘোষণা করে দেয়, তার বাপের সব জিন তার কজায় চলে এসেছে এবং তার বাপের ঘাতক জিনদেরকে চরম শাস্তি দিয়ে মারবে.......

'এর ফলে সাধারণ লোকেরা পীরজাদাকে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা শুরু করলো এবং তার পায়ে এত নযরানা দিয়ে গেলো যে, তার বাপকেও এত নজরানী দেয়নি কেউ। তবে ভেতরে ভেতরে সে আমাদেরকে খুঁজে দেখতে বলতো, আমার আব্বাজানের আসল ঘাতক কে? বের করতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে। তারপর তো আমি চলেই এলাম।'

'দেশে আপনি কবে এসেছিলেন?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম চাচা মাজেদকে।

'সেটা আরেক কাহিনী'– তিনি হেসে বললেন– 'সেটা আরেক দিন এসে শুনে যেয়ো। তবে খোদা আমাকে পুরোপুরি মাফ করেন নি। তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল আমার। তিন বছরের বেশি কেউ বাচেনি। যতটুকু বয়স্ক দেখা যায়, আমি আসলে এত বয়স্ক নই। সন্তানের শোক আমাদের বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখো আমার স্ত্রী তামীমাকে।'

আমি তার প্রৌঢ়া স্ত্রীর দিকে তাকালাম। এ বয়সেও তার চোখ মুখ অপরূপ। দেহে সতেজ এক রূপের ছোঁয়া লেগে আছে বড় সজীব হয়ে।

ঈমানের প্রদীপ্ত স্পর্শে

হিন্দু জাট এলাকার এক থানার দায়িত্বে ছিলাম আমি। জাটরা হিন্দুদের মধ্যে অনেকটা ব্যতিক্রম। লড়াই মারপিট ও দুঃসাহসিক কাজে এদের খুব নাম ডাক। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এদের আলাদা রেজিমেন্ট আছে। ইংরেজ আমলে বলা হতো 'জাট রেজিমেন্ট'।

সৈনিকি ও জমিদারী পেশাতেই প্রধানত এদের আগ্রহ বেশি।

এক সকালে শহরের সরকারী হাসপাতাল থেকে খবর এলো, সেখানে একজন বিষ খাওয়া রুগী এসেছে। তখন এ ধরনের বিষ খাওয়া বা খুন খারাবির ঘটনা এতটা ঘটতো না।

হাসপাতাল গিয়ে জানতে পারলাম, রুগীকে অজ্ঞান অবস্থায় আনা হয়েছিলো। ডাক্তার বেশ অভিজ্ঞ লোক। রুগী অজ্ঞান অবস্থায়ও যেভাবে ছটফট করছিলো তা দেখেই ডাক্তার নিশ্চিত হয়ে যান ওটা বিষ খাওয়া বা খাওয়ানোর কেস।

তবুও তাকে ইনজেকশন দেয়া হয়। এই ইনজেকশনের মাধ্যমে নিশ্চিত মৃত্যুপথের রুগীরও কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ফিরে। একেও সে ইনজেকশন দেয়া হয়, যাতে সে এতটুকুও বলে যেতে পারে যে, কে তাকে বিষ খাইয়েছে বা এ ব্যাপারে যদি কোন ইংগিতও দিয়ে যায় তাহলেও মামলা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু ইনজেকশনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি। অজ্ঞান থাকাবস্থায় মারা যায় সে।

উপশহর থেকে প্রায় চার মাইল দূরের এক গ্রামের বিরাট এক জমিদার ছিলো এ লোক। এ ধরনের জমিদারকে ঠাকুর বলা হয়। ঠাকুররা ধনে মানে খুব প্রভাবশালী হয়।

এমন একজন ঠাকুরের নিহত হওয়ার ঘটনা খুব মামুলি নয়। ডাক্তার পোষ্টমর্টেমের জন্য লাশ হাসপাতালেই রেখে ছিলেন। সেখানে ঠাকুরের বড় ছেলে ছিলো। তাকে আমি থানায় নিয়ে এলাম।

ঠাকুর হত্যার রিপোর্টের ওপর প্রথমে এফ. আই. আর লেখানোর ব্যবস্থা করলাম। তারপর ঠাকুরের ছেলেকে হালকা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। পশ্নের

উত্তরে সে যা বললো এ থেকে আরো কতগুলো প্রশ্নের জন্ম দিলো। অর্থাৎ তার উত্তরগুলো পরিষ্কার হলো না।

শুধু স্পষ্ট করে এতটুকু বুঝা গেলো, ঠাকুরের সঙ্গে কারো এমন কোন শত্রুতা ছিলো না যে, বিশ খাইয়ে প্রতিশোধ নেবে।

গ্রাম থেকে বেশ কিছু দূরে তার একটি ছোট বাগান বাড়ি আছে। বাগানে সজির ফলনই বেশি হয়।

ঠাকুর সেখানে মাঝে মধ্যে রাত কাটাতো। গতকাল রাতে বাগান বাড়িতে গিয়েছিলো। মাঝ রাতের অনেক আগেই সেখান থেকে চলে আসে। ঘরের সবাই তখন ঘুমে। সে তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগায়। শব্দ পেয়ে জেগে উঠে তার বড় ছেলেও।

তারা তখন দেখলো, ঠাকুর ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ঠাকুর জানালো, তার পেট জ্বলছে এবং সারা দেহ মুচড়ে মুচড়ে আসছে।

কেন এমন হচ্ছে? কি হয়েছে? পেরেশান হয়ে ঘরওয়ালারা জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু ঠাকুর কাতরানির শব্দ ছাড়া কোন উত্তর দিতে পারলো না। ইংগিতে কিছু একটা বুঝাতে চাইলো। কেউ কিছু বুঝলো না।

ঠাকুরের ছেলে দৌড়ে গাঁয়ের দু'জন উঝা বদ্যিকে নিয়ে এলো। তারা এসে বললো, বিষাক্ত কোন কিছু ঠাকুর সাবকে কেটেছে।

তারা ঠাকুরের হাত পা পরীক্ষা করে দেখলো, কিন্তু কাটা-ছেড়ার কোন লক্ষণ পাওয়া গেলো না। দু'জনে পরামর্শ করে ঠাকুরকে কি এক ঔষধ খাইয়ে দিলো। ঠাকুর কয়েক মহূর্ত পর বেহুশ হয়ে গেলো।

'ঠাকুর সাব এখন কিছুটা আরামবোধ করছেন। এজন্য শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সকালে উনাকে আরো ঔষধ দেয়া হবে। একথা বলে উঝা দু'জন চলে গেলো।

এক দেড় ঘন্টা পর ঠাকুর সে অবস্থাতেই বুকে পেটে খামচে খামচে হাত ফেরাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ছটফটও করতে লাগলো। সকাল পর্যন্ত তার এভাবেই কাটলো।

কিন্তু সূর্য উঠতেই তার অবস্থা আরো বিগড়ে গেলো। বয়স্ক কয়েকজন লোক তখন বললো, ঠাকুর সাহেবকে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল নিয়ে চলো। সেই অর্ধ মৃত অবস্থায় তখন ঠাকুরকে হাসপাতাল আনা হয়।

*** *** ***

আমি জানতে চাচ্ছিলাম, ঠাকুরের চালচলন কেমন ছিলো আর গ্রামের লোকদের সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কোন পর্যায়ের ছিলো। কারো ছেলে তো আর বাপ সম্পর্কে বলতে পারে না যে, সে খারাপ লোক ছিলো। তবুও ঠাকুরের ছেলেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

সে জানালো, না তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। জমিটমি নিয়েও কারো সঙ্গে বিরোধ ছিলো না। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিলো সহজ।

'তুমি বলেছো ঠাকুর মাঝে মধ্যে বাগান বাড়িতে রাত কাটাতেন। তিনি সেখানে কি করতেন? আমি হঠাৎ করেই প্রশ্নটি করলাম।

ঠাকুরের ছেলে চুপসে গেলো একেবারে।

'পানটান চলতো? তাশ খেলা হতো? না গান বাজনা হতো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি দেখিনি কখনো। মনে হয় উনার দোস্ত ইয়ারদের নিয়ে গল্পগুজব করতেন।'– সে বললো আমতা আমতা করে।

ওর দ্বিধান্বিত অবস্থা দেখে বুঝলাম, নিজের বাপ সম্পর্কে সে বেফাস কিছু বলতে চায় না।

আরেকটা সন্দেহ হলো, সে হয়তো তার বাপকে বিষ দিয়ে মারতে পারে। এ ধরনের ঘটনাও খুব বিরল নয়। এ সন্দেহটা মাথায় রেখে তার কাছ থেকে আমি জেনে নিলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা।

ছেলে বললো, তার মা জীবিত আছে। হতে পারে এটা তার সতালো মা। আপন মা মারা যাওয়ার পর ঠাকুর যুবতী কোন মেয়েকে বিয়ে করেছে। যার সঙ্গে এই ছেলের অবৈধ সম্পর্ক ছিলো।

যা হোক, ঠাকুরের ছেলে আমাকে মূল্যবান কোন তথ্য দিলো না। হয়তো মিথ্যাই বলেছে আমার সঙ্গে। যাক, এতে আমার কিছু যায় আসে না। শক্ত হলেও আসল কথা নেয়ার মতো লোক আমি ঠিকই বের করে আনবো।

ঠাকুরকে যারা হাসপাতাল এনেছে, তাদের মধ্যে থেকে দু'জনকে আমি হাসপাতাল থেকে থানায় নিয়ে এলাম। এরা ঠাকুরের আত্মীয় নয়; প্রতিবেশি। তবে একজন ঠাকুরের মতোই প্রভাবশালী স্তরের লোক।

ঠাকুরের ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ঠাকুর কেমন লোক ছিলো, আর কি কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে?

‘ঠাকুরের কোন জানী দুশমনের ব্যপারে আমার জানা নেই যে, তাকে হত্যা পর্যন্ত করবে’– প্রভাবশালী লোকটি বললো– তবে এতটুকু বলতে পারি, ‘ঠাকুর খুব ভালো লোক ছিলো না। নারী ঘটিত ব্যাপারে তো সে মোটেও সুবিধার ছিলো না’।

‘মেয়েদের মধ্যে কাদের কাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো এটা বলতে পারেন?’

সে চার পাঁচজন মেয়ের কথা বললো। কিন্তু এরা সবাই গরিব ঘরের মেয়ে। ঠাকুরকে বিষ খাওয়ানোর মতো দুঃসাহস এদের কারোই হওয়ার কথা না। সে লোক আরো জানালো, ঠাকুর তার বাগান বাড়িতে প্রায়ই মদ গান ও জুয়ার মাহফিল জমাতো। নর্তকী এনে নাচাতো। গায়িকা নর্তকীদের আনতো শহর থেকে।

অনেক সময় কেটে গেলো। ইতিমধ্যে ডাক্তার তার পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট থানায় পাঠিয়ে দিলো যে, ঠাকুরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

থানার কাজ এটা দেখা যে, ঠাকুর কি আত্মহত্যা করেছে, না তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ কারণে আমার জন্য জরুরী হলো, তার ঘর বাড়ি ও ফ্যামিলি হিস্টোরী জানা। তার বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে এবং গ্রাম্য রাজনীতিতে তার কি ভূমিকা ছিলো এটাও বের করতে হবে।

কারণ, হত্যার মামলা বা তদন্তে সর্ব প্রথম দেখা হয় হত্যার আসল উৎসটি কোথায়। এটা জানা খুবই কঠিন কাজ। অনেক গভীরে ডুব দিয়ে শরীরে কাদামাটি লাগাতে হয়।

আমি ঠাকুরের গ্রামে রওয়ানা হতে যাবো এ সময় আমার জুনিয়র সাব ইনস্পেক্টর আমাকে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে সে গ্রামেরই একটা মামলার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

চার পাঁচ দিন আগে এই ঠাকুরই তার গ্রামের এক বৃদ্ধকে নিয়ে থানায় এসেছিলো। বৃদ্ধের প্রায় সতের বছরের এক মেয়ে লাপাত্তা হয়ে গেছে। গরিব মানুষ। পুলিশের ভয়ে ও নিজের দুর্নামের ভয়ে থানায় আসছিলো না।

এই নিহত ঠাকুর সাহেব তাকে থানায় নিয়ে আসে। আমি মেয়ের লাপাত্তা হওয়ার রিপোর্টও লিখেছিলাম। আইনের চোখে মেয়ে ছিলো অপ্রাপ্ত বয়স্কা। মামলা নেয়া ও সে অনুযায়ি ব্যবস্থা নেয়া অত্যাবশ্যক।

রিপোর্ট লেখার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেয়ে কি সুন্দরী ছিলো? আর তার চালচলন কেমন ছিলো?

ঠাকুর জানালো খুব সুন্দরী ছিলো না। তবে স্বাস্থ্য খুব সুন্দর ছিলো।

মেয়ের বাবার সামনে ঠাকুর বললো, না, মেয়ের স্বভাব চরিত্র ভালোই ছিলো। কিন্তু এক ফাঁকে বৃদ্ধকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললো ভিন্ন কথা।

'আসলে ঐ বুড়োকে খুশি করার জন্য বলে ছিলাম। তার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। ঠাকুর তখন বলেছিলো– এরা মজুরী করে খেটে খাওয়া লোক। এদের মেয়েরা যৌবনে পৌছার আগেই প্রেমপ্রীতি শুরু করে দেয়। ঐ মেয়ে নিজেই ভেগেছে। আপনি এ নিয়ে বেশি ছুটাছুটি করবেন না। দেখবেন, মেয়ে নিজে নিজেই কোথাও গিয়ে উপস্থিত হয়েছে'।

আমি ঠাকুরের কথায় তখন প্রভাবান্বিত হয়নি তেমন। কারণ, এসব ঠাকুর, বড় বড় জমিদার জায়গীরদাররা ছোট ঘরের লোকদের মানুষ বলে মনে করে না। গরিব ঘরের মেয়েদের এরাই নষ্ট করে। তারপরও আমার মনে হলো ঐ মেয়ে নিজ ইচ্ছায় লাপাত্তা হয়েছে।

তবুও এ কেসের ভার থানাকে নিতে হবে। ইনস্পেক্টরের ব্যক্তিগত ধারণা এতে কার্যকরি হবে না। তাই সাব ইনস্পেক্টর বিশ্ব নাথকে এ দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে তদন্ত করছিলো। আজ এজন্য বিশ্বনাথ সে কেসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো।

'ঠাকুরের নিহত হওয়ার সঙ্গে ঐ মেয়ের লাপাত্তা হওয়ার সম্পর্ক না থাকলেও এটা মাথায় রাখলে ভালো হবে যে, সে গ্রামের এক মেয়ে লাপাত্তা হয়ে গেছো'– বিশ্বনাথ আমাকে পরামর্শ দিলো।

আমারও মনে হলো ঠাকুরের নিহত হওয়ার সঙ্গে ঐ মেয়ের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কারণ, ঠাকুর নিজেই মেয়ের বাপকে জোর করে থানায় নিয়ে এসেছিলো।

*** *** ***

ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে চার দিকে লোকের মাতম। ঠাকুরের স্ত্রী ঠাকুরের চেয়ে তিন চার বছরের ছোট হবে। চুল সাদা হতে শুরু করেছে। ছেলে যা বলেছিলো ঠাকুরের স্ত্রী তাই বললো। তার মতে ঠাকুর সেই বাগান বাড়ি থেকেই কিছু একটা খেয়ে এসেছে।

আমার মাথায় আরেকটা চিন্তা এলো। রাতে ঠাকুর বাগান বাড়ি থেকে এসেছে এটা তো তাদের অনুমান। এমনও হতে পারে, ঠাকুরকে কেউ অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বিষ খাইয়েছে।

ঠাকুরের স্ত্রী জানালো, তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক সহজ ছিলো। ঘরে কোন ঝগড়া বিবাদ ছিলো না। সে নিশ্চিত গ্রামের কারো সঙ্গে তার বিরোধ ছিলো না।

ঠাকুরের স্ত্রী কথায় আমি আস্থা রাখতে পারছিলাম না। কারণ, স্বামীর মৃত্যু তাকে বেহাল অবস্থা করে দিয়েছে। দু' একটা কথা বলেই সে কেঁদে কেঁদে উঠছিলো।

আমি বাগান বাড়িতে চলে গেলাম। ছয় সাত একর জায়গা জুড়ে বাগানটি। ঘন গাছ গাছালিতে সুন্দর সাজে পরিপাটি করে রাখা। ভেতরের বাড়িটি খুব বড় না। বড় বড় দুই কামরা বিশিষ্ট। সামনে প্রশস্ত উঠোন আছে এবং চারদিক পাচিল ঘেরা। বাগানে তিনজন মালি কাজ করে। বাগানের পাশেই তাদের যার যার সংসারের ঝুপড়ি।

মালি তিনজনকে ডেকে আনলাম। ঠাকুর মারা গেছে এ সংবাদ এরা না জানলেও এতটুকু জানে যে, ঠাকুরকে নিয়ে কোন ঝামেলা হয়েছে।

আমি তাদেরকে এক জায়গায় বসিয়ে বাড়িটি দেখার জন্য ভেতরে চলে গেলাম। এখানে এসেছিলাম আমি একাই। ঠাকুর বাড়ির কাউকে আনিনি।

দেখলাম, এক ঘরের দরজার ভেতর দিকের চাবিসহ তালা ঝুলানো। মালি তিনজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম,

'ঠাকুর এখানে না থাকলে কি দরজা তালা লাগানো থাকে?'

'জি হুজুর!– এক মালি জবাব দিলো– 'তালা তখনই খোলা হয় যখন ঠাকুরজি আসেন এখানে। সকালে দরজায় তালা না দেখে ভেবেছিলাম, ঠাকুর সাব ভেতরে শুয়ে আছেন।'

এদেরকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করার আগে ভেতরটা আরো ভালো করে দেখে নেয়া জরুরী। উঠোনটা ঘুরে ফিরে কামরার ভেতরে গেলাম। প্রথমেই নজরে পড়লো একটা বোতলের দিকে। দেশী মদের বোতল। পাশে দুটি গ্লাস রাখা। আমার পেছন পেছন হেড কনস্টেবলও চলে এসেছিলো।

তাকে বললাম, সাবধানে এগুলো উঠিয়ে নাও। কারণ, এতে আঙ্গুলের ছাপ অবশ্যই আছে। আর এই বোতলের মধ্যে যে বিশ মেশানো মদ ছিলো এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্লাস দুটোতে তখনও কয়েক ফোটা মদ লেগে ছিলো।

কামরায় একটি খাট বিছানো। সুক্ষ্ম চোখে দেখলাম, খাটের চাদর এলোমেলো হয়ে আছে। নিশ্চই এখানে কোন মহিলা বা মেয়েকে নিয়ে ধস্তধাস্তি হয়েছে। দ্বিতীয় কামরায় গিয়েও তল্লাশি চালালাম। কিন্তু এখানে এমন কিছু পেলাম না যা আমাকে তদন্ত কাজে সাহায্য করবে।

ঘরের আরেক দিকের দরজা দিয়ে বাইরে তাকালাম। সেখানে ছোট একটি উঠানের মতো খালি জায়গা আছে। এরপর ছোট একটি খাল। তারপরই ফসলি ক্ষেতের দিগন্ত বিস্তৃত সারি।

সেখানে আমার তদন্তের সাহায্যের জন্য কিছু ছিলো না। আমি প্রথম কামরায় এসে খাটে উঠে বসলাম। মালিদের একজনকে রেখে অন্য দু'জনকে কামরা থেকে বের করে দিলাম। এই মালিটি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলো। সহজ সুরে ওর সঙ্গে কথা বলে ভয় দূর করে দিলাম।

'রাতে ঠাকুরের সঙ্গে এখানে কে এসেছিলো?'- মালিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হুজুর! আমি ভালো করে দেখেছি, ঠাকুর সাব একলা এসেছিলো'- মালি বললো।

'তুমি তখন কোথায় ছিলে! বাড়ির ভেতরে ছিলে না বাইর?'

'বাগানে যারা কাজ করে পুরুষ হোক মেয়ে হোক কিংবা বাচ্চাই হোক ঐ বাড়ির কাছে ঘেষারও অনুমতি নেই। ঠাকুরজী ভেতরে থাকলে তো আমরা এদিকে আসার সাহসও করতে পারি না....

'কাল যখন ঠাকুরজি আসেন আমি তখন দেয়ালের কাছে ছিলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, নিজের ঘরে চলে যাও। আমি চলে এলাম।'

'এটা কখন?'

'সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে এসেছিলো তখন।'

'তুমি ঠাকুরের পর আর কাউকে বাগানে আসতে দেখেছিলে?'

'না, হুজুর! আমি সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।'

'তুমি তো এটা জানো যে, এখানে কি হয় না হয়? ঠাকুর কি এখানে মেয়ে মানুষ আনতো না? দোস্ত ইয়ারদের নিয়ে আনন্দ করতো না?'

'আমি আপনাকে শুধু বলছি হুজুর! ঘরের ভেতর যা হতো তা শুধু একজন লোকই জানে.... তার নাম দুর্গা। ঠাকুরজির খাস নওকর। সে সব সময় ঠাকুরজির সঙ্গে থাকতো। নওকরদের মধ্যে দুর্গাই কেবল ঐ বাড়িতে যেতে পারতো।'

'সে কি রাতেও এখানে ছিলো?'

'ও তো সূর্যাস্তের আগেই চলে এসেছিলো। আমি ভালো করে দেখেছি যে, বাইরের দরজায় যে তালা লাগানো ছিলো সেটা দুর্গা খুলেছে।'

'রাতে ঠাকুর যখন এখান থেকে বের হয় তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'আমি কিছুই জানি না হুজুর! আমি আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম। সকালে যখন বাগানে আসি তখনো আমার ধারণা ছিলো ঠাকুর সাব বাড়ির ভেতরই আছেন।'

*** *** ***

এই নওকরকে আমি অন্য কামরায় পাঠিয়ে দিলাম। যাতে সে অন্য নওকরদের সঙ্গে এখনই কিছু বলতে না পারে। তারপর দ্বিতীয় আরেক নওকরকে ডেকে আনলাম। তার জবানবন্দিও প্রথম নওকরের মতোই হলো। আমার জন্য বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া গেলো না। তাকে বলালম উঠানে গিয়ে বসে থাকো।

তৃতীয় নওকারকে এরপর ভেতরে ডেকে আনলাম। পুরনো লোক সে।

'ঠাকুর সাহেবের নওকরি কত বছর ধরে করছো?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'সঠিক জানা নেই হুজুর!– বৃদ্ধ নওকর বললো, 'মোটা মোটা হিসেবে চল্লিশ বছর তো হবেই। ঠাকুরজির বিয়ে আমার সামনেই হয়েছে।'

'তুমি কি জানো তোমাদের ঠাকুর এখন কোথায়?'

'আমরা তো বলছিলাম তিনি এখানেই শুয়ে আছেন। কিন্তু পরে জানলাম, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন হাসপাতালে আছেন।'

'আমি যদি বলি, ঠাকুর মরে গেছে, তুমি কি করবে তখন?'

'আমি কি করতে পারবো হুজুর! গাঁয়ের সব ঠাকুর মরে গেলেও তো আমি ঠাকুর হতে পারবো না। আমরা তো ঠাকুরদের নওকরি করার জন্য জন্মেছি।–

সে হালকা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো– তিনি কি সত্যিই হাসপাতালে না আপনি যা বলেছেন তাই ঠিক!'

'আমি যা বলেছি তাই ঠিক, তোমার ঠাকুর মারা গেছে। তার লাশ এখন তার বাড়িতে।'

অবিশ্বাসী চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আচ্ছা ঠাকুর নাকি মেয়েদের ব্যাপারে সুবিধার লোক ছিলো না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনি ঠিকই শুনেছেন হুজুর! পয়সা থাকলে কার চরিত্র আবার সাধু থাকে?'– বুড়ো বললো।

প্রশ্নোত্তরে এই বুড়োও দুর্গার কথা বললো।

আমি বুঝতে পালাম, দুর্গাকে আমার খোঁজে বের করা জরুরী। বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, দুর্গা এখন কোথায় থাকতে পারে? বুড়ো জানালো, ঠাকুরের হাবেলিতে, না হয় ওর নিজের বাড়িতে।

'দুর্গা লোক কেমন?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পাক্কা বদমায়েশ আদমী হুজুর!– বুড়ো নওকর এ কথা বলেই হাত জোড় করে ভীত গলায় বললো– 'হুজুর! একথা আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেছে। দুর্গা পর্যন্ত যদি আমার এ কথা পৌছে তাহলে সে আমার ঝুপড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে'।

অন্যদের মতো বুড়োও জানতো না, রাতে ঠাকুর কোথায় ছিলো। আমি এক কনস্টেবলকে ডেকে বললাম, ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে তার ছেলেকে বলো দুর্গাকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেয়।

কনস্টেবল যখন ফিরে এলো তার সঙ্গে তখন দুর্গা ছিলো না, ছিলো ঠাকুরের ছেলে।

'দুর্গা কোথায়?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি তো এ জন্যই এসেছি'– ঠাকুরের ছেলে বললো– 'বাবার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমি এমন দিশেহারা ছিলাম যে, কোথায় কি ঘটেছে সে খবরও ছিলো না আমার। দুর্গাকে তো সকাল বেলাই দেখা যায়নি। এখন পর্যন্ত তার কোন হদিস নেই।

সে তো সকাল সকাল আমাদের বাড়িতে চলে আসতো। আপনার কনস্টেবলের সঙ্গে দুর্গার বাড়িতে গিয়ে ওর মাকে জিজ্ঞেস করে ছিলাম। ওর মা ও বউ বললো, কাল সন্ধ্যায় যে দুর্গা বের হয়েছে আজ সারা দিনেও ফিরেনি দুর্গা। যাওয়ার সময় বলেছিলো, ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে।'

দুর্গার গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমার তদন্তের জন্য একটা সূত্র হতে পারে ভেবে আমি কিছুটা নির্ভার বোধ করলাম। অবশ্য দুর্গাকে ঠাকুর সাহেব কোন কাজে অন্য কোথাও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আজকের রাতটা দুর্গার অপেক্ষায় কাটাবো।

ঠাকুরের ছেলে জানালো, দুর্গা খুন জখম করার মতো লোক নয়। তবে মন্দ লোক যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রামের লোকেরা তাকে খুব ভয় পায়। সে ছিলো ঠাকুরের বডিগার্ড।

উল্লেখযোগ্য কোনই সূত্রই আমি পেলাম না। তাই রাতটা বাগান বাড়িতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। চৌকিদার ও পাহারাদাররা বাইরে যার যার

ডিউটিতে ছিলো। থানার সোর্সরাও তৎপর ছিলো বেশ। সোর্সদের মধ্যে দু'জন তো বেশ অভিজাত ঘরের লোক। কিন্তু থানা পুলিশ ও তদন্ত কাজে গুপ্তচরবৃত্তি করার কাজ করতো তারা খুব আন্তরিকতা নিয়ে। এটা ছিলো তাদের শখের পেশা।

আজকাল এ ধরনের লোক কমই পাওয়া যায়। যারা অপরাধের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে এভাবে উজাড় করে দিতে পারে।

রাতে আমি একবার থানা সোর্সদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিলাম। তবে আলাদা আলাদাভাবে। দুর্গার ব্যপারে সবাইকেই বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলাম। এটা তো সব পুলিশ অফিসারই জানেন যে, ঠাকুর, শেঠ ও জায়গীরদারদের খাস নওকর ও বডিগার্ড থাকে। মুনিবের হুকুমে তারা নারী অপহরণ ও হত্যার ঘটনা ঘটায়। মুনিবদের ফূর্তি করার উপকরণও এরাই জোগাড় করে দেয়। অনেক গোপন ব্যাপারও এরা জেনে থাকে।

সোর্সদের কাছ থেকেও জানা গলো, ঠাকুর ফুর্তিবাজ লোক ছিলো।

বাগানে জুয়া খেলা হতো, নাচ গান হতো। কারা জুয়া খেলতে আসতো, নাচগান করতে আসতো, তাদের নামের ফিরিস্তি আমার সামনে পেশ করা হলো। তবে ঠাকুর মারা যাওয়ার রাতে নাচগান করতে কেউ আসেনি।

বাগানের তিন নওকরও জানালো, নাচগান হলে তারা নিশ্চয় টের পেতো। কারণ, যখন গানবাজনা হয় তখন ঢোল তবলার আওয়াজ তাদের ঝুপড়ি থেকেও শোনা যায়।

'জনাব! সবচেয়ে দৃষ্কৃতিকারী ছিলো ঠাকুর– এক অভিজ্ঞ সোর্স জানালো– 'দুর্গার প্রতি ঠাকুর দুর্বল ছিলো এজন্য যে, দুর্গার বউটি খুব সুন্দরী। আর তার সুন্দরী একটি বোনও আছে। বয়স একুশ বাইশ হবে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে দেড় বছর ধরে বাপের বাড়ি পড়ে আছে। ঠাকুর দুর্গাদের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন।'

'দুর্গা কি তা জানতো?'

'কি জানি! দুর্গা হয়তো ঠাকুরের আসল নিয়তের কথা জানতো না। ....দুর্গার একটা জিনিস সবাই খুব পছন্দ করে, গ্রামের যেকোন মেয়ে হোক, নষ্টা মেয়ে হলেও দুর্গা সে মেয়েকে ইজ্জত করে। মন্দ দৃষ্টিতে কোন মেয়ের দিকে সে তাকায় না। এ থেকেই বুঝা যায়, দুর্গা ঠাকুরের তার বাড়িতে আসা যাওয়ার ব্যপারটা পুরোপুরি জানতো না।'

'হতে পারে, ঠাকুরের নিয়ত খারাপ ছিলো না।'

'ঠাকুরের নিয়ত ভালো হতেই পারে না। ইনস্পেকটর সাহেব! আমার তো মনে হয়, দুর্গা ঠাকুরের কাজে অন্য কোথাও যায়নি। সে আত্মগোপন করেছে। সে তার বউ বা বোনের সঙ্গে হয়তো ঠাকুরকে দেখে ফেলেছিলো। তারপর....

'কোথায় যেতে পারে সে?'

'ওর তো অনেক ঠিকানা আছে। ডাকু ও ছিনতাইকারীদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিলো।'

*** *** ***

আমি রাতের মধ্যেই চৌকিদার, পাহারাদার ও পুলিশ কনস্টেবলকে পাঠিয়ে দিলাম যে, বাগান বাড়িতে যারা জুয়া খেলতে ও নাচ গান করতে আসতো সকালে ওদেরকে থানায় হাজির করতে হবে।

আমাকে এক মহিলার কথা বলা হলো, যে ঠাকুরের বাগান বাড়িতে কাজ কর আসতো। মহিলা এমনিতে খুব সাধারণ। চার পাচ বছর হলো বিধবা হয়েছে।

অর্ধেক রাত পার হয়ে গেছে। রাতের বিশ্রাম বাদ দিয়ে দিলাম। চৌকিদারকে ডেকে বললাম, ঐ বিধবা মহিলাকে নিয়ে এসো।

মহিলা ভীত কম্পিত হয়ে আমার কাছে এলো। একে দেখেই মনে মনে বললাম, এই মহিলা আমার কাজে আসবে। বয়স তার ছত্রিশ সাতত্রিশ হবে। এ ধরনের মহিলা গ্রামের মতো শহরেও আছে। পুলিশ এদেরকে ভালো করেই চিনে।

এদের নামধাম, আকার আকৃতি ভিন্ন হলেও এদের কাজ হয় অভিন্ন। মহিলাকে আমি বসিয়ে বললাম, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যা জিজ্ঞেস করবো ঠিকঠাক জবাব দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।

আমি মহিলার চোখে চোখ রেখে মুখে মাপা হাসির রেখা ঝুলিয়ে এমন দুটি কথা বললাম, সে বুঝে গেলো আমাকে ধোকা দেয়া সহজ কাজ নয়।

ঠাকুর সম্পর্কে যা তার জানা আছে সব খুলে বলতে বললাম।

'ঠাকুর হত্যার কোন করণও যদি জেনে থাকো তাও বলে দাও'– আমি বললাম।

'আমি এত ভেতরের খবর জানি না'– মহিলা বলতে লাগলো– 'খুন করার মতো উনার সঙ্গে কারো এত শক্ত দুশমনী ছিলো এতো আমি ধরণাও করতে

পারি না। বাগানবাড়ির ঐ ঘরগুলোর ভেতর ঠাকুর কি করতেন না করতেন তা আমার জানার কথা নয়। এটা দুর্গা জানে। যে মেয়েদের সঙ্গে উনার সম্পর্ক ছিলো তা আমি বলে দিচ্ছি।'

মহিলা তিন চারটি মেয়ের নাম বললো। কিন্তু আমার সব মনোযোগ ছিল দুর্গার দিকে। মহিলাকে দুর্গার স্ত্রী ও বোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মহিলা জানালো, ওরা দু'জন খুব চালাক মেয়ে।

এই মহিলার হাতে ঠাকুর দুর্গার বউ ও বোনোর জন্য উপহার পাঠাতেন। তারা উপহার গ্রহণ করতো ঠিক; কিন্তু ঠাকুরের হাতে ধরা দিতো না। ঠাকুর ওদের ঘরে গেলে দু'জনে বেশ খাতির যত্ন করতো কিন্তু কাছে ঘেষতো না।

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, দূর্গা জেনে ফেলেছিলো, ঠাকুর তার বউ ও বোনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইতেন।'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না– মহিলা বললো– 'আমি সব সময় সতর্ক ছিলাম। অবশ্য দুর্গা যদি কোন সন্দেহ করে থাকে অথবা ওর বোন বা বউ যদি দুর্গাকে বলে থাকে সেটা তো আমার জানার কথা না।

মহিলাকে নিয়ে আমি অনেক মাথা খরচ করলাম। তার কাছ থেকে এতটুকুই পেলাম যে, ঠাকুর নারী শিকারি ছিলো। আমার মতে তার হত্যার কারণও এটাই। এখন প্রশ্ন হলো, সেই মেয়েটি কে? যার কারণে ঠাকুরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

মহিলাকে তখনোই ছেড়ে দিলাম না। হেড কনস্টেবল ও পাহারাদারকে বললাম, আমাকে দুর্গার বাড়িতে নিয়ে চলো। চৌকিদার আমাদের আগে আগে চললো।

এক বাড়ির সামনে গিয়ে দাড়িয়ে পড়লো। আমার ইংগিতে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করলো। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো না। দ্বিতীয় বার খট খটানোর পর দরজা খুললো। আমি টর্চ জালালাম।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলো এক মেয়ে। হয়তো দূর্গার স্ত্রী হবে।

চৌকিদার বললো– 'পুলিশ'।

আমি মহিলাকে উঠোনে নিয়ে আসতে বললাম। মহিলা নিজেই উঠোনে চলে এলো।

'দুর্গা কোথায়?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কাল সন্ধ্যায় বের হয়েছে। এখনো ঘরে ফিরেনি'– আতংকিত গলায় বললো।

'কোথায় গিয়েছিলো?'

'ঠাকুরের বাড়ি।'

এ সময় কামরা থেকে আরেকটি মেয়ে বেরিয়ে এলা।

'কি হয়েছে? কে এখানে?– ঘাবড়ানো গলায় বলতে বলতে সে এলো।

'আরে আলো জ্বালো, ইনি পুলিশ ইনস্পেকটর সাব'– পাহারাদার বললো।

মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে আলো জ্বালালো। ওদিকে আমার কনস্টেবলরা তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে। আমি ঘরের ভেতর চলে গেলাম। ঘরে একটি চারপায়া ছিলো।

চারপায়ার ওপর এক বুড়ি সদ্য ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে চোখ ডলছিলো। ঘরের দু'দিকে দুটি কামরা ছিলো। একটার মধ্যে গেলো হেড কনস্টেবল। আরেকটার মধ্যে আমি।

চারপায়ার নিচে, জিনিসপত্রের আড়ালে আড়ালে সব খানে খুঁজলাম। সারা বাড়িতে চিরুনী তল্লাশি চালালাম। দুর্গার ছায়াও বের করতে পারলাম না।

বুড়ি দুর্গার মা। বয়স বেশি নয়। কিন্তু সেদিন খুব জ্বর ছিলো। জরের কারণে শরীর দুর্বল হলেও মুখ চলছিলো বুড়ির পুরো দমে। একথা ওকথা বলে বিরক্তি প্রকাশ করছিলো।

কেন এত রাতে হাঙ্গামা? তার ছেলে এমন কি অন্যায় করেছে? এমন নিষ্পাপ ছেলেটাকে নিয়ে এই রাত দুপুরে হুজ্জতি করা কি ভদ্রতা?

বুড়ির কোন কথার উত্তর দিলাম না আমি।

সেখানে দুর্গার বউ ও বোন দাঁড়িয়ে ছিলো। আমার সোর্স এদের রূপ সম্পর্কে যা বলেছিলো তা আসলে অনেক কম বলেছিলো। এরা এর চেয়ে অনেক বেশি রূপসী।

ওদেরকে বাইরের কামরায় নিয়ে এলাম। আমি চারপায়ার ওপর পা তুলে বসলাম আগে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। প্রথমে দুর্গার স্ত্রীকে তারপর তার বোনকে জিজ্ঞেস করলাম।

দু'জনেই জানালো, ওরা ঠাকুরের বদ নিয়ত বুঝতে পারতো, কিন্তু ঠাকুরের দেয়া জিনিসও ফিরিয়ে দিতো না।

'দুর্গা কি এসবে সন্দেহ করতো না?'

'সন্দেহ কেন করবে?– দুর্গার স্ত্রী জবাব দিলো– 'বদ নিয়ত ছিলো ঠাকুরের। আমাদের নিয়তে কোন দোষ ছিলো না। আমাদের দু'জনের কেউ কখনো উনার সঙ্গে একা কথা বলতাম না।'

দু'জনেই খুব চালাক। দুর্গাকে যে ঠাকুর হত্যার তদন্তে আমি খুঁজছি এটা ওরা বুঝে গেলো।

দুর্গার বউ বললো, দুর্গা গ্রামের বাইরে কখনো গেলে ওদেরকে জানিয়ে যেতো। এবার তো সে কিছুই বলে যায়নি।

এর অর্থ হলো, দুর্গা কোথাও আত্মগোপন করেছে। কিন্তু আমি দুর্গার বউ ও বোনের সামনে এমন ভাব করলাম যে, দুর্গার ওপর যে সন্দেহ ছিলো তা দুর হয়ে গেছে, দর্গাকে এখন আর আমার দরকার নেই।

তবে সেখান থেকে বের হয়ে এসে আমার দুই সোর্সকে বলে দিলাম, দূর থেকে যেন দুর্গার বাড়ির ওপর নজর রাখে।

*** *** ***

বলা যায় এক প্রকার শূণ্য হাতেই থানায় ফিরে এলাম। থানায় এসে দেখলাম আমার জন্য সাতজন লোক হাজির করা হয়েছে। ঠাকুরের বাগান বাড়িতে এরা জুয়া খেলতে আসতো। এর মধ্যে তিন চারজন উঁচু ঘরনার লোক। অন্যরা পেশাদার জুয়াড়ি। এর মধ্যে তো একজন দু' বছর জেল খেটে যাওয়া দাগী আসামী।

পেশাদার অপরাধী ও জুয়াড়িদের জিজ্ঞাসাবদ একটু অন্য ধরনের হয়। কারণ এদের কাছ থেকে কথা আদায় করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। এই মামলায়ও এরা আমাকে মুশকিলে ফেলে দেয়। তবে পরে আমি সব ঠিক করে নিই। ভেতরের কথা বের করতে বাধ্য করে তুলি।

এরপর যারা অপেশাদার ছিলো তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করি। এরা সৌখিন জুয়াড়ি এবং এ পথে আনাড়ী। এখনো অন্য কোন অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়েনি। পুলিশের মুখোমুখিও এই প্রথম হয়েছে।

বড় বড় জমিদার ও জায়গীরদারদের ছেলে ছেলে ওরা। নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে পুলিশের সামনে পেটের সব কথা উপড়ে দেয়। ঠাকুরের কথাবার্তা এমন করে বললো যেন এরা তার দুশমন ছিলো। এরা আমার কিছু সন্দেহ দূর করলেও সেখানে নতুন সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কখনও মনে হচ্ছে আমার তদন্ত সঠিক ভাবে এগুচ্ছে। আবার কখনো মনে হচ্ছিলো আমি ভুল পথে যাচ্ছি।

হত্যার কারণ তো নারীঘটিত প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হতে পারে। এই সূত্রে এক যুবতীর নাম উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার পরকীয়া পুরুষের নামও এলো। আরো দুই

নর্তকীর নাম উঠলো। ঠাকুর এদেরকে কখনো কখনো বাগান বাড়িতে ডেকে আনতেন।

এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে চার পাঁচ দিন কেটে গেলো। জিজ্ঞাসাবাদে এরাও আরো কয়েকজনের নাম সন্দেহভাজনের তালিকায় ঢুকিয়ে দিলো। এদের পেছনে আরো কয়কে দিন লাগলো।

এসব থেকে আমি উল্লেখযোগ্য কিছুই পেলাম না। দর্গারও কোন খোঁজ নেই। তাই বাধ্য হয়ে আমি দুর্গার আকার আকৃতির বর্ণনাসহ অন্যান্য রিপোর্ট জেলার সমস্ত থানায় নিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

দুর্গার স্ত্রী ও বোনকে রাতের বেলা ওদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম পুলিশ প্রহরায়। আর দিনের বেলায় থানায় এনে আটকে রাখতাম। এটা এজন্য করছিলাম যে, দুর্গা যদি জানতে পারে তার ঘরের যুবতী মেয়েদের এভাবে বেইজ্জতী করা হচ্ছে তাহলে সে নিজেই থানায় এসে আত্মসমর্পণ করবে।

দুর্গার বউ ও বোনকে কয়েকবার বলেছি, শুধু এটা বলো যে, ঠাকুর তোমাদের ইজ্জতের ওপর হাত উঠিয়েছিলো। তোমাদেরকে হয়রানি থেকে মুক্তি দেবো। ওরা তা অস্বীকার করেছে।

আমার সন্দেহ ছিলো, ওরা জানে যে, দুর্গা তার স্ত্রী ও বোনের বেইজ্জতীর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ঠাকুরকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে।

ওদিকে মদের বেতাল ও গ্লাসের ওপর আঙ্গুলের ছাপের রিপোর্ট ইলাহাবদ থেকে চলে এসেছে। অন্যদিকে ঠাকুরের পোষ্টমর্টেমের রিপোর্টও এসে গিয়েছিলো।

এতে সত্যায়ন করা হয়েছে, নিহত ব্যক্তিকে বিষয় দেয়া হয়েছিলো। থানায় ও থানার বাইরে যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম তাদের হাতের ছাপ আগেই নিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু কারো হাতের ছাপের সঙ্গেই বোতল ও গ্লাসের ছাপের মিল খুঁজে পেলাম না। অর্থাৎ এখনো আমরা ঠাকুরের হত্যাকারীর কেশও স্পর্শ করতে পারিনি।

তদন্ত কাজে শহর থেকে বিশ মাইল দূরের এক গ্রামেও যেতে হয়েছিলো। সেখানে ঠাকুরের কাছে আসা যাওয়া ছিলো এমন দুই নর্তকীর জবানবন্দি নিতে হয়েছিলো। তাদের পেছনে আরো তিন দিন নষ্ট করি। কিন্তু লাভের খাতা এখানেও শূণ্য।

তবে পাওয়া গেছে এতটুকু যে, এখন যাকে খুঁজে বের করতে হবে সে হলো দূর্গা। অন্যান্য পুলিশ অফিসাররাও বলেছে, দুর্গা সাধারণ কোন অপরাধী নয়, তার হাত অনেক লম্বা।

*** *** ***

বাইশ তেইশ দিনের ঘটনা। ঠাকুর হত্যার তদন্ত কাজ আগের জায়গাতেই ঝুলে আছে। হঠাৎ এক দিন আমাদের ওপর মুসিবত নেমে এলো। আমাদের ইংরেজ ডিএসপি থানায় এসে হাজির।

ডিএসপি ও এসপিরা এভাবেই কোন না কোন থানায় এসে হাজির হয় এবং চলতি তদন্তনাধীন মামলার ফাইল ঘেটে দেখেন, থানা পুলিশরা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা। তখন বিশেষ করে ইনস্পেক্টরদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়েন।

অবশ্য মাঝে মধ্যে তারা খোশ মেজাযেও আসেন এবং থানা ও এর আওতাধীন এলাকা পরিদর্শন করে চলে যান।

কিন্তু এবার ডিএমপি এলেন ভিন্ন উদ্দেশ্যে। তিনি এসেই নিহত ঠাকুরের গ্রামের কথা বলে বললেন,

সেখান থেকে যে এক মেয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছিলো তার ফাইলটি বের করো।.........

ঐ মেয়ের বাবাকে থানায় নিয়ে এসেছিলো এই নিহত ঠাকুর। ঐ কেস আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। তাই এর তদন্তভার দিয়েছিলাম আমার জুনিয়র সাব ইনস্পেকটরকে।

ঠাকুর তখন বলেছিলো, ঐ মেয়েকে কেউ অপহরণ করেনি, মেয়ে নিজেই কোথাও চলে গেছে। আমার ধারনাও ছিলো তাই। এর দুই তিন দিন পরই ঘটে ঠাকুরের বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনা। আমি তখন এই মামলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

ডিএসপি সাহেব ফাইল দেখলেন। সাব ইনস্পেক্টর এই ফাইলে অনুমান নির্ভর কিছু কথা লিখে ফাইল তাকবন্দি করে রেখেছিলো।

ডিএসপি চোখ গরম করে বললেন, এক মাসে এতটুকু তদন্ত হয়েছে?

আমরা মাথা নিচু করে রাখা ছাড়া কোন জবাব দিতে পারলাম না।

ডিএসপি খাস গাইয়া ভাষায় আমাদেরকে অনেক গালাগাল করলেন। এই ভাষা কোত্থেকে যে তিনি শিখেছেন আল্লাহই ভালো জানেন।

চাবুক মারার মতো ভাষায় বললেন, তোমরা এই মামলাকে শুধু এ কারণে ফাইল চাপা দিয়ে রেখেছো যে, অপহৃত মেয়ে এক গরিব বাপের মেয়ে। তোমরা সেসব মামলাতেই আগ্রহ পোষণ করো যেগুলোর তদন্ত করতে গিয়ে তোমরা খাতির যত্ন পাও।

‘তোমরা ধোকাবাজ। বেঈমান হিন্দুস্তানি’– তিনি বললেন।

ডিএসপি জানালেন, অপহৃত ঐ মেয়ের বড় ভাই ফৌজে ল্যান্স নায়েকের পদে আছে। সে তার বোনের হারিয়ে যাওয়ার খবর জানতে পারে তার বাবার প্রেরিত চিঠি মাধ্যমে।

চিঠিতে তার বাবা একথাও লিখে যে, এই মামলার তদন্তের ব্যপারে পুলিশের মোটেও আগ্রহ নেই।

নায়েক চিঠি পেয়ে মামলার তদন্তে গুরুত্ব দেয়ার জন্য তার কমান্ডিং অফিসারের কাছে দরখাস্ত লিখে। কমান্ডিং অফিসার দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয় ব্রিগেড কমান্ডারকে। ব্রিগেড কমান্ডার নায়েকের জেলার ডিপুটি কমিশনারকে এ ব্যপারে দরখাস্ত সংযুক্ত করে এক হুকুমনামা পাঠায়। ডিপুটি কমিশনার সেটা পাঠিয়ে দেয় পুলিশে আইজিকে।

উপরন্তু এসব সেনা কর্মকর্তা ও পুলিশ অফিসার ছিলো ইংরেজ। তখন চলছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ইংরেজদের অবস্থান তখন খুব একটা সংহত ছিলো না। তাদের পক্ষে হিন্দুস্তানী সৈন্যরা বিভিন্ন ফ্রন্টে জানবাজি রেখে লড়ছিলো। এজন্য ইংরেজরা হিন্দুস্তানি সৈন্যদের সন্তুষ্ট রাখতে অনেক কিছুই করতো।

কোন মামুলি সিপাহীও যদি তার কমান্ডিং অফিসারকে দরখাস্ত দিতো যে, তার গ্রামে তার খান্দানের লোকরা অমুকের শত্রুতার শিকার। কমন্ডিং অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ডিপুটি কমিশনারের মাধ্যমে সে এলাকার পুলিশ ইনস্পেকটরকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য হুকুম দিয়ে দিতো।

আমাদের ডিএসপিও তার উপরওয়ালের হুকুমেই এসেছেন। তিনি ইংরেজ হওয়ায় এক হিন্দুস্তানি সৈন্যের অভিযোগ দূর করতে কম আন্তরিক ছিলেন না। ডিএসপি সাহেব সাব ইনস্পেক্টরকে হুকুম দিলেন, এখনই অপহৃত সেই মেয়ের গ্রামে তদন্ত শুর করো।

‘তোমাদেরকে আমি কোর্ট মার্শাল করিয়ে ছাড়বো’– ডিএসপি সাহেব জলদ গম্ভীর কণ্ঠে হুমকি দিলেন– ‘শুধু পাঁচটা দিন সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে। আমি সঠিক রিপোর্ট চাই। ঐ মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে, না সে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছে। অপহরণ হলে রিপোর্টের সঙ্গে আসামীকেও হাজির করতে হবে।’

ডিএসপি সাহেব আমাদের রক্ত পানি করে চলে গেলেন। আমরা ঠাকুর হত্যা মামলাসহ অন্যসব মামলার কাজ স্থগিত রেখে ঐ মেয়ের অপহরণ মামলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

*** *** ***

তদন্ত কাজে দু'দিনের মধ্যেই আমাদের নাভিশ্বাস উঠে গেলো। যে গ্রামের যাকেই সামান্য সন্দেহভাজন মনে হতো তাকেই ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। মাত্র পাঁচ দিনের এত অল্প সময়ে একটা কেসকে সুরতহাল করার এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি আর হতে পারে না।

এ পদ্ধতি ছাড়া আমি আরেকটা পদ্ধতি বের করলাম। সেটা হলো, সারাক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করা। উঠতে বসতে আমি দরবারে এলাহীতে আর্জি জানাতে লাগলাম।

হে আল্লাহ! আমার ঈমানদারী ও আমানতদারীর সম্মান আপনি অক্ষুণ্ন রাখুন। এই চ্যালেঞ্জে আমাকে সফল করুন। এই কেসের সঠিক সুরতহাল করে দিন। আল্লাহ তাআলা মনে হয় তার দয়ার সাগরে আমার আর্জি কবুল করে নিলেন।

তদন্তের তৃতীয় দিন। আমি ও আমার সাব ইনস্পেক্টর রাম সাহা মিলে গ্রামের এক তৃতীয়াংশ লোককে থানা থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছি। কিন্তু সে মেয়ের নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারলাম না। মেয়ের নাম হলো দুলারী। ডিএসপির দেয়া সময় পাঁচ দিনের মধ্যে আর মাত্র দুই দিন বাকি আছে।

তৃতীয় দিনের সূর্য অস্তগামীর পথে। সাব ইনস্পেক্টর রাম সাহাকে দুলারীদের গ্রাম থেকে ফিরে আসতে দেখা গেলো। তার চাল চলনেই বুঝা যাচ্ছিলো, আজও সে ব্যর্থ হয়েছে।

তার মুখটি শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেছে। আমার সামনের চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে এমনভাবে বসলো যেন সে পরাজয় মেনে নিয়েছে। তার এ অবস্থা দেখে আমার মুখ দিয়েও কথা সরছিলো না। এ সময় পোষ্ট অফিসের এক পিওন আসলো।

সে ভেতরে না এসে আমাকে বাইরে রেখেই ইশারায় ভেতরে ডাকতে লাগলো। প্রথমে আমি রেগে গেলেও মনে হলো সে যেন কিছু এটা বলতে চায় যা আমার জন্য জরুরী। মনে মনে বললাম, রাখো, তুমি যদি এছাড়া অন্য কোন সুপারিশ নিয়ে এসে থাকো তাহলে তোমাকেও সাইজ করে ছেড়ে দেবো।

'আমি আপনার পোষ্ট অফিসের ডাক পিওন'– আগন্তুক পিওন বললো– 'আমি গ্রামে গঞ্জে পোষ্ট অফিস থেকে চিঠি বিলি করি। যে গ্রামের মেয়ে লাপাত্তা হয়েছে সে গ্রামেরও দশ বারটি চিঠি ছিলো আমার কাছে। আপনি জানেন,

গ্রামের লোকেরা সাধারণত লেখাপড়া খুব একটা জানে না। তাই তাদের চিঠি আমাকেই পড়ে দিতে হয়।

'আমি একটা চিঠি পড়লাম, এটা লিখেছেন এক হাবিলদার। লাপাত্তা হয়ে যাওয়া মেয়ের ভাই নায়েক জগমোহন যে জাট রিজিমেন্টে আছে ইনি সেই রেজিমেন্টেরই হাবিলদার।

হাবিলদার তার স্ত্রীকে লিখেছেন, নায়েক জগমোহনের বোন দুলারী তার বাসায় আছে। ঐ হাবিলদার বাড়িতে কিছু একটা পাঠাবেন। তিনি লিখেছেন, সে জিনিসটি দুলারীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। হাবিলদার এও লিখেছেন, তিনি তার রেজিমেন্টের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে দূর্গা নামের এক লোককেও দেখেছেন।'

আমার কাছে মনে হলো, এই ডাক পিওন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। না হয় আমি স্বপ্ন দেখছি। অথবা এ লোক মিথ্যা বলছে।

'তুমি কি বাজে বকছো?'– আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো– 'দুলারীর ভাই নিজেই তো দরখাস্ত দিয়েছে তার বোন দুলারী লাপাত্তা হয়ে গেছে। এটা কি করে বিশ্বাস করবো যে, সে তার বোনকে নিজের কাছে রেখেছে এবং তার বোন অপহরণ হয়েছে বলে তদন্তের দরখাস্ত করেছে,......... আর ঐ দুর্গাই বা সেখানে কি করছে?'

'আপনি স্যার হাবিলদারের ঘরে চলে যান'– ডাক পিওন বললো– 'আমি জানি, দুলারী লাপাত্তা হয়ে যাওয়াতে গ্রামের ওপর কেমন বিপদ নেমে এসেছে। সে গ্রামে পুলিশের সাধারণ কোন কনস্টেবলকে দেখলেই লোকজন এদিক ওদিক পালাতে শুরু করে। হাবিলদারের বাপ হাত জোড় করে আমাকে বলেছে, আমি যেন কাউকে এই চিঠির কথা না বলি। তাহলে পুলিশ তাদের সবাইকে থানায় নিয়ে যাবে। তারপর মারপিট করবে.......

'আমি স্যার.... নিজের দায়িত্ব পালন করেছি। প্রয়োজন হলে আমি এই চিঠির ব্যাপারে সব রকম সাক্ষ্য দেবো। সময় মতো শুধু আমাকে ডেকে পাঠাবেন।'

ডাক পিওনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করলাম। তারপর আর বিলম্ব করলাম না। সাব ইনস্পেক্টর রাম সাহা ও দুই কনস্টেবলকে নিয়ে হাবিলদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

এলাকার চৌকিদারের মাধ্যমে হাবিলদারের বাড়ি চিনে নিলাম। দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে দিলো হাবিলদারের বাবা।

বুড়ো তার সামনে দুই পুলিশ অফিসারকে দেখে ভয়ে যেন কাঁপতে লাগলো। আমার ভয় হলো, অজ্ঞান না হয়ে যায় আবার। হাতজোড় করে আবোল-তাবোল বকতে লাগলো।

'ভয় নেই চাচা'!– আমি তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বললাম– 'আমরা আপনাকে কিছু করতে আসিনি। আপনার ছেলে যে চিঠিটি পাঠিয়েছে সেটা দিয়ে দিন।'

'হুজুর!– বুড়ো বললো– 'হুজুর! আমি গরিব মানুষ। আমি চিঠি দিয়ে দেবো। কিন্তু আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন না। চিঠি পড়ে দেখুন। আমার ছেলেরও কোন দোষ নেই।'

ততক্ষণে ঘরের সবাই জেগে উঠেছে। ভেতরে সঙ্গে সঙ্গে আলোও জ্বালানো হয়েছে। কারো ফুঁপানির আওয়াজও আসছে। বুঝা গেলো, পুলিশের ভয়ে কাঁদছে। পুলিশ তো আসলে ভালো মানুষের বন্ধু। তাহলে কেন যে পুলিশকে মানুষ এত ভয় পায়!

চিঠি নিয়ে এলো বৃদ্ধ। চিঠিটা পড়ে দেখলাম। চিঠি পড়ে বুঝা গেলো, হাবিলদার এটা জানেন না যে, যে মেয়ের কথা তিনি লিখেছেন সে গ্রাম থেকে লাপাত্তা হয়ে গেছে। আর পুলিশ সারা গ্রামে চিরুনী অপারেশন শুরু করে দিয়েছে। তিনি হয়তো ভেবেছেন, সেই মেয়ে এমনিই তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছে।

হাবিলদারের বাপকে বললাম, ভয় নেই কোন। তাকে শুধু আমার সাক্ষী বানাবো। শুধু এতটুকু বললেই হবে যে, আমি আমার ছেলের চিঠি পেয়েছিলাম। আর চিঠি ডাক পিওন পড়ে শুনিয়েছে।

ভয় বৃদ্ধকে এমনভাবে জাপটে ধরেছিলো যে, আমার পায়ে পড়ে বলতে লাগলো, যা বলবেন হুজুর তাই করবো। তবুও থানায় নিবেন না।

বৃদ্ধকে আমি উঠিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এবার বৃদ্ধ যেন কিছুটা আশ্বাস পেলো। তার মুখে হাসি ফিরে এলো।

*** *** ***

পরদিন ভোরেই লরিতে করে ডিএসপি সাহেবের হেডকোয়ার্টারে রওয়ানা হয়ে গেলাম। লরি এক ঘন্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে দিলো। ডিএসপি তখনও অফিসে আসেননি। আমি তখন উত্তেজনায় টগবগ করছি। অপেক্ষা করতে পারলাম না। ডিএসপির বাংলোয় চলে গেলাম।

তিনি তখন তৈরী হয়ে বের হচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই আগুন দৃষ্টিতে ঘুরে তাকালেন। আমি স্যালুট করলাম।

'কি রিপোর্ট এনেছো?— তিনি ধমকে উঠলেন— 'ঐ মেয়ের কেসের রিপোর্ট এনেছো, না অন্য কোন ধান্ধায়?'

আমি পকেট থেকে হাবিলদারের চিঠিটা তাকে দিলাম। কাগজের ভাঁজ খুলে চিঠিটা আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

'পড়ে শোনাও'— বিরক্ত হয়ে বললেন— 'জানো না, আমরা তোমাদের ভাষা শুধু বলতে পারি লিখতে পারি না?'

আমি চিঠি পড়ে শুনিয়ে জানালাম কিভাবে এ চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। তারপর ডিএসপি সাহেবের কাছে অনুরোধ রাখলাম, আমাকে যেন জবলপুর সেনা ছাউনির ঐ জাট রেজিমেন্টে যাওয়ার অনুমতিপত্র লিখে দিন, যাতে ওখানে গিয়ে আমি তদন্ত করতে পারি।

'আমার অফিসে চলো।'

ডিএসপি আমাকে সরকারী অনুমতিপত্র দিয়ে দিলেন। এ দিয়ে আমি যেকোন রেজিমেন্টে গিয়ে তদন্ত কাজ চালাতে পারবো এবং এতে এও লেখা আছে যে, সেনা অফিসাররা যেন আমাকে সহযোগিতা করে।

পর দিন সন্ধ্যায় আমি জবলপুর পৌছলাম। সেখানকার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে রাতটা কাটালাম।

সকালে সেখানকার এসপির সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। পুরো ঘটনা তাকে শোনালাম এবং সরকারি অনুমতি পত্রও দেখালাম। তিনি আর্মি ব্রিগেডিয়ারকে ফোনে কি যেন বললেন এবং আমার পথ পরিষ্কার করে দিলেন।

দিনের সাড়ে এগারটায় আমাকে পৌছে দেয়া হলো জাট রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের দফতরে। এতেই দুলারীর ভাই নায়েক জগমোহন আছে। আমার কাগজ দেখলেন তিনি।

'ঐ মেয়ে এখানে আছে সেটা আপনি কি করে জানলেন'?- ইংরেজ কর্ণেল আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হাবিলদারের চিঠি তাকে পড়ে শোনালাম। তিনি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। বললেন,

'আমরা যদি চাপ না দিতাম- কর্ণেল বললেন— 'তাহলে আপনারা পাত্তাই দিতেন না এ কেসকে। আমরা দেখতে চাই, পাবলিকের প্রতি আপনারা কতটুকু খেয়াল রাখেন আর নিজেদের দায়িত্বে কতটুকু যত্নবান।'

'সাহেব বাহাদুর!– আমি বললাম– 'যদি একটি মেয়ে এমন একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায় যাকে গ্রামের সবাই বদমায়েশ বলে জানে এবং সবাই অনেক ভয় পায় তাহলে আমাদের তদন্ত কি করতে পারবে? এই চিঠিতে দুর্গা নামে যার কথা এসেছে সে অনেক বড় বদমায়েশ। এতো এক হত্যা মামলায় পুলিশের চোখে আসামী। হত্যার রাত থেকেই এ দুর্গা লাপাত্তা।'

'আপনি কি নিশ্চিত হত্যার আসামী সেই?'

'নিশ্চিত তো হওয়া যাবে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের পর সাহেব বাহাদুর'!

তবে পরিস্থিতি ও সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। আপনার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি, ঐ মেয়ে ও দুর্গাকে আমার কাছে হাওলা করে দিন। আপনার রেজিমেন্টের কিছু লোকের জবানবন্দিও আমার প্রয়োজন হতে পারে। আমি আপনার সহযোগিতার জন্য দরখাস্ত পেশ করছি।'

কর্ণেল কিছু একটা ভাবতে লাগলেন। তারপর তার ক্যাপ্টেনকে ডাকিয়ে আনলেন। ইংরেজীতে সলাপরামর্শ করতে লাগলেন তারা।

দুই ইংরেজের ধারণা ছিলো, আমি ইংরেজি বুঝি না। অথচ আমি এফ, আই পাশ করে সরাসরি আই, এম, আইতে ভর্তি হয়েছিলাম। ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে ইংরেজিতেই আমি কথা বলি।

'এরা তো দেখি আমাকে বেওকুফ বানিয়েছে'– কর্ণেল ক্যাপ্টেনকে বললেন– নায়েক জগমোহন তো কখনো একথা বলেনি যে, যে লোক তার বোনকে কয়েদি থেকে উদ্ধার করে এনেছে সে নিজেই অনেক বড় বদমায়েশ। এই ইনস্পেক্টর তো জোর সন্দেহ করছে, গ্রামে সে কাউকে হত্যা করে এসেছে।'

'স্যার! মাফ করবেন– ক্যাপ্টেন বললো– এদেরকে প্রথমেই আমাদের বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। এই হিন্দুস্তানিদের রাজনীতিই হলো মিথ্যা বলা। প্রথম দিনই ঐ মেয়ে ও ঐ বদ লোককে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া উচিত ছিলো আমাদের।'

'শোন ক্যাপ্টেন!– কর্ণেল বললেন– 'আমি দেখতে চাই, আমাদের হিন্দুস্তানি পুলিশ নিজেদের ডিউটিতে কতটা কার্যকর, আমার কাছে মনে হয়েছিলো, এই মেয়েকে গ্রামের কোন জমিদার বা শেঠ অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে, এ নিয়ে ওরা যে কাহিনী শুনিয়েছে সেটা সত্যি নয়......

'আমি চাই, নায়েক জগমোহন, তার বোন ও ঐ লোককে পুলিশের হাওলা করে দেয়া হোক। ইনস্পেক্টর এখানেই তদন্ত করে দেখুক। আসল ঘটনা আমিও জানতে চাই। আমি নিজে এই রিপোর্ট ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারকে লিখে পাঠাবো।

না হয় এরা নিজেরা আবার এক জোট হয়ে উল্টা পাল্টাও কিছু করে বসতে পারে। তখন সব ঝামেলা আমার ওপর এসে পড়বে..... সুবেদার মেজরকে বলো, ওদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিতে।'

কর্ণেল আমাকে বললেন, ওদেরকে এখানে আনা হচ্ছে। আমি ইংরেজিতে বললাম, তাহলে তো আমার জন্য কাজ সহজ হয়ে গেলো।

'ইনস্পেক্টর! আপনি তো চমৎকার ইংরেজি বলেন। খুশি হলাম।– কর্ণেল বললেন উচ্ছ্বাসিত হয়ে।

*** *** ***

একটু পর তিনজনকে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। দুর্গাকে দেখেই আমি চিনে ফেললাম। দুটো ডাকাতি কেসে সে আসামীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে ছিলো। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা সাক্ষ্য।

ক্যাপ্টেন আমাকে তদন্তের জন্য পৃথক কামরায় নিয়ে গেলেন। সেখানে ছিলো তিনটি চেয়ার ও একটি বড় রেভলিং চেয়ার।

প্রথমে আমি ঐ মেয়েকে ডেকে পাঠালাম।

'দেখো, দুলারী'– আমি দুলারীর চোখে চোখ রেখে বললাম– 'গ্রামে গঞ্জে সব ধরনের মিথ্যাচার, ধোকাবাজি চলে। পুলিশ ও আর্মি কর্মকর্তার সামনে যদি মিথ্যা বলো, ইংরেজ অফিসার তোমাকে বাইরে দাঁর করিয়ে গুলি করে মারবে। না হয় সারা জীবনের জন্য তোমাকে জেলে পাঠিয়ে দেবেন। এখন একমাত্র আমিই আছি, যার সামনে তুমি সত্য বললে নিরাপদ থাকবে।

'এটা তো অবশ্যই সত্য যে তুমি দুর্গার মতো বদমায়েশের সঙ্গে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছো। আর এখানে এসে তুমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে ইংরেজ অফিসারদের ভিন্ন কথা শুনিয়েছো।'

'না না'- দুলারী এমনভাবে বললো যেন তার গলায় ছুরি চালানো হচ্ছে- 'আমি দুর্গার সঙ্গে ঘর থেকে বের হইনি। আমাদের গাঁয়ের ঠাকুর আমাকে অপহরণ করে তার কাছে বন্দি করে রেখেছিলো। অবশ্য সে আমাকে কোন কষ্ট দেয়নি। অনেক অপ্যায়ন করেছে। আর সবসময় বলেছে, আমাকে বিয়ে করতে চায়।'

এই মেয়ের কথা শুনে আমার মনে হলো, পুরো কামরা আমার মাথার সঙ্গে ঘুরছে। কল্পনাও করিনি, এই মেয়ের কেস ঠাকুরের কেসের সঙ্গে এভাবে জট পাকিয়ে যাবে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, ওকে কি জিজ্ঞেস করবো। মনে হচ্ছিলো, কোন সিনেমায় আমি অভিনয় করছি।'

'তুমি কোন ঠাকুরের কথা বলছো'? দুলারীকে জিজ্ঞেস করলাম।

সে ঐ ঠাকুরের কথাই বললো যাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার নাম ছিলো কালি রায় ঠাকুর।

'আমার কথা মন দিয়ে শোন দুলারী। তোমাকে বলেছি আমি মিথ্যা বললে তোমার কি পরিণাম হবে। পুরা ঘটনা তুমি খুলে বলো।'

'ঘটনা ছিলো এরকম'– দুলারী বলতে শুরু করলো– আমি সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের বকরিগুলো বাড়ি নিয়ে আসছিলাম। গ্রাম থেকে একটু দুরে কয়েকটি টিলা আছে। জায়গাটি খুব নির্জন। সেখান দিয়ে আসার সময় ওপর থেকে হঠাৎ আমার মাথার ওপর মোটা একটা কাপড় এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে কেউ আমার দু'হাত শক্ত করে ধরে ফেললো। ভয়ে আমি চিৎকার করতে লাগলাম।

'তখন আরেকজনের আওয়াজ এলো– 'ওর মুখ বেঁধে দাও'–....

'ওরা আরেকটি কাপড় দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিলো। তিন চারজন ছিলো। ওদেরকে রুখার মতো শক্তি আমার ছিলো না। তারপর তারা আমাকে নিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়লো। হয়তো অন্ধকার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো। কথা বলছিলো না কেউ।

'অন্ধকার নামার পর তারা আমাকে দুজন করে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলো। পালা করে আমার দেহ কাঁধ বদল হতে লাগলো....

'অনেক পর আমার মনে হলো, একটা দরজা খুলেছে। অর্থাৎ আমাকে কোন কামরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এক কামরায় নিয়ে গিয়ে আমাকে খাটের ওপর নামিয়ে রাখলো ওরা। তারপর আমার মুখের বাঁধন খুলে দিলো। মাথার ওপর থেকে মোটা চাদরটিও সরিয়ে নিলো।

দেখলাম, সেখানে তিন চারজন লোক রয়েছে। দু'জনের চেহারা কাপড়ে ঢাকা। ওরা বাইরে বলে গেলো। আমার সামনে এখন দু'জন দাঁড়িয়ে। একজন ঠাকুর। আরেকজন ছিলো দুর্গা। দু'জনকে দেখে আমি কেঁপে উঠলাম......'

'আমি যদি খারাপ মেয়ে হতাম তাহলে কোন চিন্তা ছিলো না। কিন্তু আমার কাছে জীবনের চেয়ে ইজ্জত অনেক প্রিয়' ....

'আমি কাঁদতে শুরু করলাম। মিনতি করে বলতে লাগলাম। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। ভেবেছিলাম, ওরা আমাকে নিয়ে জোর জবস্তি করবে। কিন্তু তারা তা করলো না। ঠাকুর আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমাকে তিনি খারাপ উদ্দেশ্যে উঠিয়ে আনেন নি।

তিনি ভগবানের কসম খেয়ে বললেন, তিনি আমাকে বিয়ে করবেন। দুর্গাও আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলো।

আমি ওদেরকে বললাম, বিয়ে কি

মানুষ এভাবে করে? ..... আমার বাপকে বলো, তিনি গরিব মানু। বললেই তিনি বিয়েতে রাজি হয়ে যাবেন......।

'ঠাকুর বললেন, তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমার বাবা তখন চিঠির মাধ্যমে আমার ভাইয়ের মতামত চান। ভাই নিষেধ করে দেন।

ঠাকুর আমাকে একথাও বলেন, তুমি আমার মনে এমনভাবে ঢুকে পড়েছো যে, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না।

দুর্গা খারাপ লোক ঠিক, কিন্তু সেও আমাকে বললেন, দেখো দুলারী! সত্য কথা হলো, তোমাকে না পেয়ে নিশ্চয় তোমার বাপ পেরেশান হবে। আমি তাকে বলবো, তোমার মেয়েকে আমি খুঁজে বের করে দেবো।

'কামরায় দুটি দরজা ছিলো। দরজা দুটি তালা লাগিয়ে ওরা চলে গেলো। সারা রাত ভয়ে ভয়ে কাটালাম আমি। ওরা আমাকে সামান্যতম বিরক্তও করেনি। পরের দুদিন ঠাকুর আমাকে বুঝিয়ে গেলো, আমি যেন দু' একটা দিন ধৈর্য ধরি তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বুঝতে পারলাম, আমার ইজ্জত নিয়ে ঠাকুরের মতলব খারাপ নয়। হলে তো ঠাকুর যেকোন সময় তার মনোবাসনা পুরন করতে পারতো.......

'ঠাকুর অনেকগুলো টাকা ও সোনার অলংকার আমার সামনে রেখে মিনতি করে বলতে লাগলেন,

আমি তোমাকে রাণী বানিয়ে দেবো। তার এই বিনয় ভাব ও টাকা পয়সা দেখে ঠাকুরের প্রতি করুণায় ভরে উঠলো আমার মন। আমি তাকে বললাম, এগুলো আপনার কাছে রেখে দিন। আগে আমার বাপকে রাজি করান।'

'আচ্ছা দুলারী! দূর্গা কি সব সময় ঐ কামরায় থাকতো?

'না সে মাঝে মধ্যে আসতো'।

'দুর্গা তোমাকে ভয় দেখাতো না?'

'না জনাব! দুর্গা তো খুব সুন্দর করে কথা বলতা। তৃতীয় রাতে ঠাকুর আমার জন্য বিরাট খাবারের আয়োজন করলেন। বললেন, আজ তোমাকে দারু (মদ) পান করাবো।'

'আমি বললাম, ছিঃ ছিঃ এগুলো তো খারাপ জিনিস। আমি পান করবো না। ঠাকুর বড় করুণ গলায় বললেন, আমি এত করে বলছি, দু'এক ঢোক পান করে

দেখো না। তার মন গলানো ব্যবহার দেখে আমি রাজি হয়ে গেলাম। তিনি অন্য কামরায় চলে গেলেন। হয়তো শরাবের বোতাল ওখানে ছিলো.....

*** *** ***

'এ সময় দুর্গার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছিলো। পরক্ষণেই ঠাকুর খালি হাতে এ কামরায় এসে আমার সামনে বসে পড়লো। তার পর দুর্গা এলো। তার হাতে শিরকার দুটি গ্লাস ছিলো। একটি গ্লাস আমার হাতে দিলো। আরেকটি ঠাকুরের হাতে।

'খাও খাও'– ঠাকুর বললেন। আমি ভয়ে ভয়ে একটু মুখে নিলাম। তিতায় আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেলো। ঠাকুর তখন আমার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিলেন। ঠাকুর আর দুর্গা এক নিঃশ্বাসে গ্লাস শেষ করে ফেললো। তাদের বার বার বলায় আমি একটু একটু করে আমার গ্লাসও খালি করে ফেললাম। ঠাকুর ভাজা মুরগির একটা বড় টুকরার প্লেট সামনে রাখলেন .....

'ঠাকুর তখন বললেন, আমার মাথাটা ঘুরছে।

দুর্গা বললো, তাহলে আরেকটু পিয়ে নিন। দুর্গা আরো অর্ধেক গ্লাস এনে ঠাকুরের হাতে দিলো। ঠাকুর সেটা মুখে দিয়েই কখনো তার পেটে কখনো মাথায় হাত ফেরাতে লাগলেন। চোখমুখ কুচকে বললেন–

'দুর্গা! তুমি ভুল করোনি তো?'– দুর্গা হেসে বললো, সে কি ঠাকুর সাব!

দুর্গা এ কথা বলে কি বোঝাতে চাইলো বুঝলাম না আমি......

'ঠাকুরের অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছিলো। দুর্গাকে বললেন, তার বাড়িতে পৌছে দিতে। দুর্গা বললো, তিনি যেন আস্তে আস্তে হেটে বাড়িতে চলে যায়। সে গেলে দুলারী এখানে একলা রয়ে যাবে। ঠাকুর বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে চলে গেলেন। একটু পর দুর্গা আমাকে বললো, দুলারী! চলো এখান থেকে পালাতে হবে।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?'– আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শোন! এখানে থাকলে তুমি মারা যাবে'– দুর্গা বললো– 'তুমি কুমারী মেয়ে। ঠাকুর তোমাকে এক সন্যাসীর কথায় অপহরণ করেছে। দু'একদিনের মধ্যে তোমাকে কতল করে তোমাকে দিয়ে জাদু টোনা করবে। তখন ঠাকুর বিরাট ধন ভাণ্ডারের মালিক বনে যাবে।'

'আমার সন্দেহ হলো'– দুলারী বলে গেলো– 'দুর্গা মনে হয় আমাকে ধোকা দিচ্ছে। কিন্তু সে যখন পুরো কথা বুঝিয়ে বললো আমি শুধু বিশ্বাসই করলাম না,

ভয়ে কুকড়ে গেলাম। দূর্গা তো এখানেই আছে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। ওর সঙ্গে আমি ঠাকুরের বাগান বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। রাতভর আমরা পায়দল চললাম।

'সকালের দিকে দুর্গা আমাকে এক গ্রামে নিয়ে গেলো। সেখানে তার পরিচিত এক বাড়ির পৃথক কামরায় নিয়ে আমাকে বসালো। এক বুড়ি আমাকে এক বাটি দুধ ও দু'টি পরোটা খাওয়ালো।

অনেক্ষণ পর দুর্গা এলো। আমাকে বললো, তোমাকে আমি তোমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবো। আমার কাছ থেকে জেনে নিলো আমার ভাই থাকে জবলপুর জাট রেজিমেন্টে.......

'এবার দুর্গার ওপর আমি সন্ধিহান হয়ে উঠলাম। তকে বললাম, তুমি আমার বাপের কাছে না নিয়ে ভাইয়ের কাছে কেন নিয়ে যাবে?

সে বললো, আমরা তোমার গ্রামে গেলে ঠাকুরের লোকেরা আমাদের আস্ত রাখবে না। তাছাড়া পুলিশ তার হাতে আছে। আমাদেরকে সোজা জেলখানায় চালান করে দেয়া হবে। তাই তোমার ভাইয়ের কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা তাকে শোনালে সে সবকিছু বুঝতে পারবে।

আমি অপরাগ ছিলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ওর সঙ্গে যাওয়াটাই স্থির করলাম। আল্লাহর নাম জপতে লাগলাম। গ্রাম থেকে দেড় দুই ক্রোশ দূরে রেল স্টেশন। এক লোক ঘোড়ার গাড়িতে করে আমাদেরকে রেল স্টেশনে পৌঁছে দিলো ....

'পরদিন আমরা জবলপুর জাট রেজিমেন্টের ছাউনিতে পৌঁছলাম। জিজ্ঞেস করে করে এখানে পৌঁছলাম। তারপর আমার ভাইকেও খুঁজে পাওয়া গেলো। ভাই তো আমাকে দেখে দারুন হয়রান গেলেন।

দুর্গা ভাইকে বললো, সব কথা আপনার বোনের কাছে শুনুন। আমি সংক্ষেপে সব ভাইকে শোনালাম। ভাই বললেন, তোমরা বসো এখানে, আমি আসছি। অনেক্ষণ পর আমার ভাই এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ভাইয়ের সঙ্গে আরেকজন ছিলেন। তিনি এখানকার সুবেদার। আমাকে সুবেদার ঘরে রেখে গেলেন। দুর্গাকে অন্য কোয়ার্টারে রাখা হলো.........

'ভাই প্রায়ই এসে আমাকে দেখে যেতেন। বলতেন, তিনি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উপরস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত দিয়েছেন। পুলিশ হয়েতো একদিন এসে তোমাদেরকে নিয়ে যাবে। না হয় আমি ছুটির পর তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো'।

'একদিন এক মহিলা সুবেদারের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলো। মহিলাকে আমি চিনে ফেললাম। তিনি আমাদের গ্রামের। তার স্বামী এখানকার হাবিলদার।'

'হাবিলদারের স্ত্রীকে তুমি কি বলেছিলে?'

'বলেছি, আমি ভাইকে দেখতে এসেছি। মহিলা দুর্গাকে চিনতো। জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এই বদমায়েশ এখানে কি করে এলো?

আমি তাকে বললাম, ও আমার ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও আমারও ধর্ম ভাই। আসলে আমার ভাই নিজেই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি তোমার ভাইকে দেখতে এসেছো....... তারপর তো আপনি এলেন'.........

*** *** ***

দুলারীকে অন্য কামরায় পাঠিয়ে দুর্গাকে ডেকে আনলাম।

'দেখো দুর্গা!– আমি দুর্গাকে বললাম– 'এখন তুমি শুধু পুলিশের হাতেই নও আর্মির হাতেও বন্দি। আমি উপযুক্ত প্রমাণ নিয়েই এ পর্যন্ত এসেছি। দুলারী তার ভেতরের সব কথা আমার কাছে খুলে বলেছে। কিছুই সে লুকোয়নি। তোমার বয়ান যদি সামান্যতমও এর বিপরীত হয়, দেখবে তোমার কি অবস্থা হয়। এখন বলো আসলে কি হয়েছিল?'

'হুজুর!- দুর্গা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– 'লোকে আমাকে বলে দুর্গা বদমায়েশ। বদমায়েশকে মানুষ বদমায়েশই তো বলবে। বদমায়েশ ভালো কিছু করলেও লোকে বলে এর মধ্যেও বদমায়েশি কিছু আছে। আমি একটা ভালো কাজ করেছি তবে বদমায়েশি কায়দায় করেছি। আপনি একে নিশ্চয় পুলিশি ও আইনের দৃষ্টিতে দেখবেন। কিন্তু আপনি কি এটা মানবিক দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন না?'

'আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিচ্ছো দুর্গা! তুমি যদি ভালো কাজ করে থাকো এর প্রতিদান তোমাকে আমি দেবো। কিন্তু তুমিও ওয়াদা করো আমার কাছে কিছুই লুকাবে না।'

'হুজুর এর আগে বলুন ঠাকুরের এখন কি অবস্থা?'

'ওর তো ছাইও এখন আর অবশিষ্ট নেই। মারা গেছে।'

দুর্গার সঙ্গে এ ব্যপারে অনেক কথা হলো। আমি ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করে গেলাম। অবশেষে সে রহস্যের পর্দা উঠত শুরু করলো। ঠাকুরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই বদমায়েশি সূত্রেই– দুর্গা বলতে লাগলো–

'তিনি ছিলেন আমার মুনিব। আমার কারণে তিনি নিরাপদ থাকতেন। আর আমার টাকা পয়সা, আরাম আয়েশের সব প্রয়োজন তিনি পূর্ণ করতেন।........

'একদিন ঠাকুর আমাকে একটা গোপন কথা জানালেন। আমাদের গ্রাম থেকে দুই আড়াই মাইল দুরে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি আছে। ওখানে সাধু সন্নাসীরা থাকে। ঠাকুরকে কেউ বলেছে, সেখানে এক সন্নাসী আছে। যার হাতে গায়েবী ইলম আছে। কিন্তু সন্নাসী কাউকে সেটা বলে না। তবে কারো প্রতি সন্নাসী খুশি হয়ে গেলে তার বাড়ি টাকা পয়সা ও সোনা রূপায় ভরে যায়।

ঠাকুর তার কাছে যাওয়া আসা শুরু করলেন। তাকে শরাবের কয়েকটা বোতল দিলেণ। টাকা পয়সাও দিলেন অনেক।

আমাকে ঠাকুর বলতেন, সন্নাসীকে তিনি হাত করে নিয়েছেন। তার হাতে সত্যিই গায়েবী কিছু আছে....

'একদিন ঠাকুরকে বেশ আনন্দিত মনে হলো। আমাকে ঘর থেকে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, দুর্গা দাস! আমার কাজ আর মুসিকল হবে না। যদি একটা কাজ করতে পারো, তোমার ঘর দৌলতে ভরে যাবে।'–

আমি জানতে চাইলাম কি কাজ?

'ঠাকুর বললেন– ঐ সন্নাসী বলেছেন, খেয়াল রাখবে, গ্রামের কোন কুমারী মেয়ে যদি সোমবার রাত শেষে মঙ্গলবার মারা যায় তাহেল তার মাথার খুপড়ির হাড় যেটা চার ইঞ্চি থেকে কম হতে পারবে না- সেটা জোগাড় করে আনতে হবে।

সন্নাসী বলেছে, সে হাড়টি আমার কাছে আনতে হবে। আমি এর ওপর আমল করবো এবং তোমাকে দিয়ে দেবো। এই হাড় বিশেষ কোন এক সময় যদি লোহার টুকরার ওপর ঘুরানো হয় লোহ সোনা হয়ে যাবে.....

'ঐ হাড় বিশেষ এক সময়ে তোমার ঘরের এক কোনায় রেখে দেবে। দেখবে, অগনিত পয়সা তোমার কাছে আসছে।'

ঠাকুর আমাকে বললেন, 'আমি সারা গায়ের মেয়েদের ব্যপারে খোঁজ খবর নিয়েছি। একটি মেয়ে আমার চোখে পড়েছে। যার বয়স ষোল বছরের চেয়ে কম ও সতের বছরের বেশি হবে না। আমার বিশ্বাস সে ভদ্র মেয়ে এবং কুমারী........

'ঠাকুর দুলারীর কথা বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে, সে মেয়ে এই বয়সেই মঙ্গলবার মরে যাবে।

তিনি বললেন– এ কাজটাই তো করতে হবে তোমাকে। তুমি সুযোগ বুঝে ওকে উঠিয়ে আনো। তার মৃত্যু হবে এমনভাবে যে রক্তও বের হবে না এবং সেদিন হবে মঙ্গলবার'।

আমি ঠাকুরকে এ থেকে ফেরাতে অনেক চেষ্টা করলাম। তাকে এও বললাম, আমার বিশ্বাস হয় না, কোন মানুষের এমন অদৃশ্য শক্তি থাকতে পারে। কিন্তু ঠাকুর কোন কথাই শুনতে তৈরী ছিলেন না।

তিনি আমাকে বললেন, যা খুশি তুমি চাও তোমাকে আমি দেবো, আগে মেয়েকে উঠিয়ে আনো। পরে যা করার করবো আমি। এরপর শুধু বাকি থাকবে লাশ গায়েব করার কাজ।'

*** *** ***

এরপর দুর্গা সে কথাই শোনালো যা দুলারী বলেছিলো। দুর্গার নেতৃত্বেই দুলারীকে অপহরণ করা হয়েছিল।

'ঘটনার রাতে আমি ঠাকুরের বাগান বাড়ির কামরায় গিয়ে দেখলাম, ঠাকুর সেখানে রয়েছেন'– দুর্গা তার বয়ানে বললো– তার সামনে ছিলো শরাবের দুটি গ্লাস। পাশে শরাবের বোতল পড়েছিলো। আমি যে কামরার দরজায় এসেছি ঠাকুর সেটা টের পাননি। দেখলাম, তিনি ছোট একটা পুরিয়া খুলে শরাবের একটা গ্লাসে ঢেলে দিলেন। তারপর গ্লাসটা হাতে নিয়ে হালকাভাবে ঝাকি দিলেন। সেটা ছিলো সামান্য পাউডার.......

'আমাকে মুহূর্তের জন্যও ভাবতে হলো না। আমার মনে ডেকে উঠলো, ঠাকুর একটি গ্লাসে শরাবের সঙ্গে বিশ মিশিয়েছেন। আর এটা পান করাবে দুলারীকে। আমার মনে পড়ে গেলো, আজকে সোমবার। এই বিশ খাওয়ানর পর দুলারী নিশ্চয় আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত মরে যাবে.....

আচমকা ঠাকুর আমর দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, ভালো করেছো তুমি এসেছো। আমাদের সঙ্গে তুমিও খেয়ে পিয়ে নাও। ঠাকুর গ্লাস দু'টি হাতে নিয়ে অন্য কামরার দিকে রওয়ানা দিলেন।

আমি তাকে বাঁধা দিয়ে বললাম– 'ঠাকুর জি! খুব খারাপ দেখাচ্ছে, আপনি সাধারণ একটি মেয়ের সামনে নিজ হাতে গ্লাস নিয়ে গিয়ে রাখবেন। আমি আপনার নওকর। এ তো আমার কাজ। গ্লাস ও খাবার দাবার আপনার ও দুলারীর সামনে নিয়ে রাখবো।–'

যে গ্লাসে পাউডার মেশানো হয়েছে ঠাকুর তার ওপর হাত রেখে বললেন, এ গ্লাসটি দেবে দুলারীকে.....

'ঠাকুর তো মহা খুশি আমি তাকে মহারাজা বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হুজুর! জানি না আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন কিনা: আমার ভেতর তখন অন্যরকম এক পরিবর্তন এসে গেলো।

আমি তো জানতামই, এই মেয়েকে ঠাকুরের হাতে মরতে হবে। কিন্তু যখন মদের মধ্যে পাউডার মেশাতে দেখলাম তখন বুঝে গেলাম, এটা বিষ। তাছাড়া ঠাকুর বিশেষ করে আমাকে বলেছে, ঐ গ্লাসটি দুলারীর সামনে রাখতে হবে। আমার ওপর ঠাকুরের শতভাগ আস্থা ছিলো। ঠাকুর অন্য কামরায় চলে গেলেন....

'আমার ভেতর কী যেন কেপে উঠলো, আহা! বুড়ো এক বাপের একটি মাত্র মেয়ে। বাপও শরীফ লোক। বেটিও শরীফ ......হুজুর। আমি অনেক মন্দ লোক। কিন্তু গাঁয়ের যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখুন কখনো কোন মেয়েকে আমি আপত্তিকর চোখে দেখিনি'।

'আমার বোনের কথা মনে হলো আমার, যে বিধবা হয়ে আমার ঘরে বসে আছে। ওকে যদি এভাবে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং ধোকা দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে তাহলে আমার বৃদ্ধ মার কি অবস্থা হবে?

আমার এটাও মনে পড়লো, দুলারীকে আমিই উঠিয়ে এনেছিলাম। তার বাপের না জানি কি অবস্থা.....।

'ঠাকুর আপনাকেও তো ধোকা দিয়েছিলো। দুলারীর বাপকে থানায় নিয়ে এসে মেয়ের অপহরণ মামলা দায়ের করে যায়। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম দুলারীকে বাঁচাতে হবে। আর এই ঠাকুর বাঁচলে অনেক মানুষের ক্ষতি করবে। গ্লাস পাল্টে দিলাম। ঠাকুরের সামনে রাখলাম বিষের গ্লাস। আর দুলারীর সামনে রাখলাম ঠাকুরের গ্লাসটি।

আমি ঠাকুরের দিকে তাকালাম। ঠাকুরও আমার দিকে তাকালেন। আমি তাকে চোখ টিপে দিলাম। ঠাকুরের ঠোঁটে তখন নিষ্ঠুর হাসি ঝুলছিলো। ঠাকুর তো নিশ্চিত ছিলেন, সকাল পর্যন্ত দুলারী শেষ হয়ে যাবে। তখন তার খুপড়ির হাড় কেটে নেয়া হবে। এরপর বাগানে কোথাও লাশ মাটি চাপা দিয়ে রাখবে।

ঠাকুর জানতেও পারলেন না আমি তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বড় আয়েশ করে গ্লাসের সবটুকু মদ ঠাকুর সাবাড় করে দিলেন।'

'শরাবে বিষ মেশানো হলো কেন? দুধ বা অন্য কোন খাবার জিনিসেও তো মেশাতে পারতো?'

'আসলে শরাব যেহেতু একটু তিতকুটে হয় তাই এতে বিষের স্বাদ জিহ্বায় অনুভূত হয় না। আর এটা ঠাকুরেরই আবিস্কার ছিলো যে, শরাবে বিষ মেশানো হবে।

'আমি অনুমান করছিলাম, ঠাকুর সকালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই অনুমান করার কারণ হলো, ঠাকুর দুলারীকে মঙ্গলবার সকালে মৃত অবস্থায়

দেখতে চাচ্ছিলেন। ঠাকুর যখন বিষের ক্রিয়া সহ্য করতে না পেরে তার বাড়ির দিকে রওনা করেছিলেন আমি তখন দুলারীকে নিয়ে সেখান থেকে পালালাম। এক গ্রামে আমার এক বন্ধু ছিলো। যে পেশাদার ছিনতাইকারী। সেটা অন্য থানায়। রাতের মধ্যেই দুলারীকে ওখানে নিয়ে গেলাম.......

'আমি ওকে ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেখানে আপনার হুলিয়া আমার ওপর ঝুলছিলো। তা ছাড়া ঠাকুর যদি মরে গিয়ে না থাকে তাহলে তো.........

আসলে আমি এমন কাজ করতে পারবো কখনো তা ভাবতে পারিনি। তাই কোন কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না। দিশেহারার মতো হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি ওকে আমার ছিনতাইকারী বন্ধুর ওখানে নিয়ে গেলাম।'

'এটি সেই ছিনতাইকারী যে একবার আমার এলাকায় ধরা পড়েছিল? তারপর তুমি ওর ছাফাই গেয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলে'- আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জি হুজুর! সেই'— সে বললো আমাকে, 'আগের ইনস্পেক্টরের সঙ্গে তার চুক্তি ছিলো। তখন সে নিরাপদও ছিলো। কিন্তু নয়া ইনস্পেক্টর এসেই তাকে হুমকি দিয়েছে যে, এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও না হয় জানে মেরে ফেলবো। এজন্য সে নিজেই সেখান থেকে গাঠুরী গোল করছিলো। আমাকে সরাসরি বললো, ভাই! এই মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে এখনই পালাও, না হয় তোমরা ধরা পড়ে যাবে..........

'তখন ওর সঙ্গে সলা পরামর্শ করে ঠিক করলাম, দুলারীকে তার ভাইয়ের কাছে পৌছে দেয়াই নিরাপদ। কারণ, ইংরেজরা ফৌজকে অনেক কদর করে। পুলিশ সে পর্যন্ত যেতে পারবে না। তবে দুলারীর ভাই নায়েক জগমোহন আমাকে বললেন, তুমি যে ঠাকুরকে বিষ দিয়োছো এটা আমার কর্ণেলকে জানানো যাবে না। তাহলে কর্ণেলই তোমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে দেবে'।

*** *** ***

দুর্গার জবানবন্দির পর দুলারীর ভাইয়ের জবানবন্দি নেয়ার আর প্রয়োজন ছিলো না। তবুও আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার্থে নেয়া হলো তার জবানবন্দি। এসব ঘটনা আমি রিপোর্ট আকারে লিখে ঐ রেজিমেন্টের কর্ণেলকে শোনালাম। কর্ণেল ক্ষেপে গেলেন এ কারণে যে, তারা তার কাছে বিষের ঘটনা লুকিয়েছে।

এমনিতে কর্ণেল দূর্গার কৃতিত্বে খুশি ছিলেন। যেস এক অবলা নারীকে মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু মিথ্যাচার তাদের কাছে অসহ্য।

যা হোক, কর্ণেলের পরামর্শে এবং সাক্ষ্যের খাতিরে দুর্গা, দুলারী ও তার ভাই জগমোহনকে নিয়ে রাতের মধ্যেই গাড়িতে করে আমাদের থানায় চলে এলাম।

সকালে দুর্গাকে নিয়ে ঐ সন্নাসীর ডেরায় অভিযান চালিয়ে তাকে থানায় নিয়ে এলাম। এক হিসেবে সন্নাসী আইনের চোখে অপরাধী নয়। কিন্তু ধোকাবাজ হিসেবে অবশ্যই অপরাধী।

সন্নাসীকে জিজ্ঞেস করলাম, ঠাকুরকে সে যে জাদু বিদ্যা দিয়েছে এতে কি সত্যিই মাথার হাড় দিয়ে লোহাকে সোনা বানানো যায়?

'আমি কখনো পরীক্ষা করে দেখিনি– সন্নাসী জবাব দিলো– 'আমার উস্তাদ আমাকে শুধু এটা শিখিয়েছিলো। আমি শেখালাম ঠাকুর সাবকে। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম, এমনভাবে সব দিক দিয়ে মিলিয়ে কোন মৃত মেয়ের হাড় কেউ আনতে পারবে না।'

সন্নাসীকে ছেড়ে দিলাম। থানায় এসে পূর্ণ রিপোর্ট তৈরী করে ডিএসপি সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ডিএসপি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

তবে দুর্গার বদলে যাওয়া চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করে দিলো। এক নিষ্পাপ মেয়েকে বাঁচানোর জন্য প্রভাবশালী এক বদকারকে শশ্মানে পাঠিয়ে দিয়েছে। মানবিক দিক দিয়ে এটা অবশ্যই পুরষ্কার পাওয়ার উপযুক্ত ঘটনা। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি দুর্গাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আইনের দাবী বড় নির্মম।

আমার দায়িত্বও পালন করতে হবে এবং আইনকেও সাহায্য করতে হবে। আমি দুর্গার বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা মোতাবেক শাস্তির মামলা দায়ের করলাম। আর দুর্গাকে বললাম, তুমি বিষ দেয়ার ঘটনা স্বীকার করবে না। আদালতে দাঁড়িয়ে বলবে, দুলারীকে সে ওখান থেকে যখন নিয়ে যায় তখন ঠাকুর ওখানে ছিলো না।

আর আমিও এমন সাক্ষ্য পেশ করলাম না যে, ঘটনার রাতে ঠাকুর তার বাগান বাড়িতে ছিলো, আর দুর্গাও যে সেখানে গিয়েছিলো এমন সাক্ষ্য পেশ করলাম না।

দুর্গার উকিলও ছিলো খুব জাদরেল লোক। আদালত দুর্গার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারলো না। তারপর দুর্গা বেকসুর খালাস পেয়ে গেলো।

এর দু'দিন পর দুর্গা, তার বোন, স্ত্রী ও তার মা এবং দুলারী, তার ভাই ও বাপ আমার কাছে এসে আর্জি জানালো, মুসলমানদের মধ্যে যে মানবিক বদান্যতা এভাবে চর্চিত হয়, সৎ কাজের এত কদর করা হয় তা তাদের জানা ছিলো না। তাই তারা মুসলমান হতে চায়।

থানা মসজিদের ইমাম সাহেবের মাধ্যমে তাদেরকে কালেমা তায়্যিবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' –পড়িয়ে ইসলামে দীক্ষিত করা হলো।

অবশ্য পরে ইংরেজ ডিএসপি ওদের মুসলমান হওয়ার ঘটনাও শুনেছিলেন। তিনি এ ঘটনায় খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না। মাস তিনেক পর থানা পরিদর্শনে এসে আমাকে বললেন,

'তোমরা শুধু আসামী ধরে ধরে শাস্তিই দাও না, হিন্দু ধরে ধরে মুসলমানও বানাও।'

এক ইংরেজের মুখে এমন ব্যঙ্গাত্মক বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আমার কাছে ভালো লাগলো না। আমার চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে চাকরির মায়া চলে গেলো। আমি দৃঢ় গলায় জবাব দিলাম,

'স্যার! ওদেরকে যদি মুসলমান না বানিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টান বানাতাম তাহলে নিশ্চয় আমি আপনার চোখে পুরস্কারের যোগ্য হতাম! কিন্তু এখন তিরস্কারের যোগ্য।'

ডিএসপি সাহেব ভাবেন নি, আমি মুখের ওপর এমন কথা বলতে পারবো। তিনি থতমত খেয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ তাঁর ভুলটি বুঝতে পেরেছিলেন।

তাঁর লাল বর্ণের মুখটি আরো লালচে হয়ে উঠলো।

ব্যাপারটি আমাকে দারুন আনন্দ দিলো।

সমাপ্ত

■ design : najmul haider ■ shaj creation